মুসলিম নারীর অধিকার ও দায়িত্ব ইসলামের ইশতিহার ও সনদ

ফায়সাল বিন খালেদ

সম্পাদনা

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

2011 - 1432

IslamHouse.com

সূচিপত্র

ভূমিকা

মূলতঃ আমরা এখন খুবই খারাপ একটি বর্তমান যাপন করছি এবং একটি অশুভ আগামীর দিকে যাচ্ছি। এই কাল পাশ্চাত্যকরণের কাল। প্রতীচ্যীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি, চিন্তা ও জীবন যাপন পদ্ধতি তার বাইরের সব এলাকাতেই আগ্রাসন চালাচ্ছে, সব কিছুকে পাশ্চাত্যকরণের চেষ্টা চালাচ্ছে। নানা ঐতিহাসিক ও মৌলিক কারণে পাশ্চাত্যীয় এই আগ্রাসনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ইসলাম। ভোগবাদী, বস্তুবাদী ও ধর্মহীন পাশ্চাত্যীয় ডিসকোর্স, পাশ্চাত্যের প্রধান সংগঠন ও ব্যক্তিদের ধারণা ও বক্তব্য , নির্বিচারে ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি ও মূল্যবোধগুলোকে আক্রমণ করছে। ইসলামী চিন্তা ও সংস্কৃতির কোন এলাকাই পাশ্চাত্যের এই আক্রমণ থেকে নিরাপদ নয়। তবে তাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যবস্তু নারী ,ইসলামের নারী-ভাবনা ও নারী সম্পর্কে তার সিদ্ধান্তগুলো। পাশ্চত্যীয় ডিসকোর্সের দাবী নারী সম্পর্কে ইসলামের মনভাব সেকেলে, নিচুস্তরের এবং খুবই অসভ্য। নারীর ক্ষেত্রে ইসলামের বিধানগুলো পীড়নমূলক। ইসলাম নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার দেয়নি। বলাবাহুল্য পাশ্চাত্যের মিথ্যে প্রচারণামূলক এই ডিসকোর্স অনেকাংশে সফল। কারণ তাতে এমনকি অনেক মুসলমানও বিভ্রান্ত হচ্ছেন এবং ইসলামী শরীয়তের ব্যাপারে তাদের আস্থা শিথিল হয়ে যাচ্ছে। ঐতিহাসিক লড়াইয়ের স্বভাব যারা জানেন তারা বুঝেন এর পরিণতি ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জন্য খুব সুখকর হবে না।

পাশ্চাত্যের ইসলাম বিরোধী এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইসলামের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিরোধের ব্যর্থতার একটা ব্যাখ্যা দাঁড়

করানো সম্ভব। কিন্তু চিন্তা ও সংস্কৃতির মাঠে ইসলামী ডিসকোর্সের ব্যর্থতার কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা নেই। রাজনৈতিক প্রতিরোধের ব্যার্থতার দোহাই দিয়ে মুসলিম চিন্তাবিদরা চিন্তা ও সাংস্কৃতিক লড়াইয়ে অগ্রিম হার স্বীকার করে নিতে পারেন না। সেটা হবে আত্মঘাতি। তাদেরকে এই লড়াই করতেই হবে। কারণ চিন্তা ও সংস্কৃতির এলাকাই পাশ্চাত্যীয় এই আগ্রাসনের প্রধান লক্ষ্য। পাশ্চাত্যের আগ্রাসন কখনো কখনো, কোন কোন স্থানে রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে সফল হতে পারে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ যদি তার দ্বীনের প্রতি আস্থা না হারিয়ে ফেলে, তাহলে এই লড়াইয়ে পাশ্চাত্য কখনোই জয়ী হতে পারবে না। ব্যাপকভাবে মুসলিম উম্মাহর উপর আধিপত্য করতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন :

﴿ وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ آل عمران: ٦٩

অর্থাৎ ‘আহলে কিতাবের একটি দল তোমাদেরকে ভ্রষ্ট করতে চায়। কিন্তু তারা শুধু নিজেদেরকেই ভ্রষ্ট করবে। তারা সে সম্পর্কে সচেতন নয়’। সুরা আলে ইমরান।

﴿ وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً ﴾ النساء: ٨٩

অর্থাৎ ‘তারা কামনা করে তোমরা যেন কুফুরী কর, ফলে তোমরা তাদের মত হয়ে যাবে’। সুরা আন্‌নিসা।

আমরা দেখিয়েছি পাশ্চাত্যের এই আগ্রাসনের অন্যতম প্রধান এলাকা সমাজ এবং বিশেষত নারী সংক্রান্ত বিষয়গুলো। উপরের আলোচনা থেকে আমরা কয়েকটি মূলনীতি উদ্ধার করতে পারি।

এই মূলতনীতিগুলো থেকে আমরা জানতে পারি সমাজ হচ্ছে মূলত জাতীর সচেতনতার ফল। সত্য-কল্যণ-সংস্কারের প্রতি আহ্বানের ব্যাপারে তাদের সাড়া এবং অকল্যাণ-অন্যায় প্রাতিরোধে তাদের তৎপরতা প্রকাশের নামই সমাজ। তাই এই বিষয়গুলো যারা নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় তারাই এই সামাজিক লড়াইয়ে জয়ী হয়।

তাই আমরা মনে করি নারী সম্পর্কে ইসলাম কি মনোভাব পোষণ করেছে এবং কি সিদ্ধান্ত দিয়েছে ইসলামী ডিসকোর্সে এই সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা হওয়া দরকার। বর্তমান লেখায় মূলত আমরা, আমাদের সাধ্যমত, সে দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছি। আলোচনা করেছি নারীর ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তের অবস্থান কি, মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থান কি হবে, ইসলাম নারীকে কী কী অধিকার ও দায়িত্ব দিয়েছে।

আলোচনাকে আমরা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত তবে সারসমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। আমাদের আলোচনা আবর্তিত হবে প্রধান চারটি বিষয় ও শিরনামকে কেন্দ্র করে :

-মৌলিক পূর্বাবস্থান-অনুমানসমূহ

-নারীর অধিকার ও দায়িত্ব বিষয়ে শরীয়তের মূলনীতিসমূহ

-কয়েকটি মূলনীতির প্রতিপাদনমূলক ব্যাখ্যা

-নির্দেশাবলী

প্রথমত
মৌলিক পূর্বানুমান ও অবস্থান

এই ক্ষেত্রে কিছু পূর্বাবস্থান ও সিদ্ধান্ত রয়েছে, যা নারীর অধিকার ও দায়িত্ব বিষয়ে শরীয়তের মূলনীতিগুলোর ঝোঁক ঠিক করে দেয়, তার প্রবণতা ও সিদ্ধান্তগুলো নির্ধারণ করে দেয়। এর মধ্যে প্রধান পূর্বাবস্থানগুলো :

১. যাবতীয় কল্যণ ও সত্যের , পার্থিব ও পরকালীন উভয় ক্ষেত্রে , উৎস হচ্ছে ওহী বা প্রত্যাদেশ অর্থ্যাৎ পবিত্র কোরআন ও হাদীস, জীবনের যাবতীয় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এই উৎসতেই ফিরে যেতে হবে, কোন ক্ষেত্রে তার বিরোধিতা করা যাবে না, দৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস ও আস্থা পোষণ করা। কারণ, উম্মাহর সর্বসম্মতিক্রমে, এটা ঈমানের একটি মৌলিক অঙ্গ এবং তার শর্ত। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন :

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ النساء: ٦٥ অর্থাৎ 'আপনার রবের কছম তাদের ঈমান আনা হবে না, যদি না তারা তাদের মাঝে বিবদমান বিষয়গুলোতে আপনাকে বিচারক মানে এবং আপনার সিদ্ধান্তকে নিঃসংকোচে ও পূর্ণাঙ্গভাবে মেনে নেয়'– সূরা নিছা (৬৫)। ইসলামী ডিসকোর্সের একটি স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হচ্ছে, 'রবুবিয়্যাত'-এ বিশ্বাস। অর্থাৎ এই বিশ্বাস রাখা যে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক তথা গোটা মানবীয় জীবনের যাবতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত ও বিধান দেওয়ার এক মাত্র অধিকার আল্লাহ তায়ালার। স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তের আরেকটি হচ্ছে

'উলুহিয়্যাত'-এ বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের অর্থ সর্ব ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহকেই বিচারক মানা ও একমাত্র তারই ইবাদত করা।

২. দৃঢ়ভাবে এ-বিশ্বাস রাখা যে, ইসলামী শরীয়ত স্থান ও কাল ভেদে জীবনের সব এলাকায় সফল ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। এই দ্বীন ও তার যাবতীয় মৌলিক ও আনুষাঙ্গিক বিধানগুলোর প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রাখা এবং বিশ্বাস করা যে, এই দ্বীনের পুরোটাই কল্যাণকর, সুবিচারী এবং মানুষের জন্য এক মহা আশীর্বাদ। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন :

﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾ الإسراء: ٩

অর্থাৎ 'এই কোরআন সঠিকতম পথের নির্দেশনা দেয় এবং সৎকর্মশীল মোমেনদের এই সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহা প্রতিদান'। সূরা ইছরা (৯)। এই বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে হবে কারণ, এই বিধানের উৎস প্রজ্ঞাবান ও সূক্ষ্ম জ্ঞানী আল্লাহ, যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে যার পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন :

﴿ أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ المائدة: ٥٠

অর্থাৎ 'তারা কি জাহেলিয়্যাতের বিধান চায় ? যাদের ইয়াক্বীন আছে তাদের জন্য আল্লাহর বিধানের চেয়ে ভাল আর কোন বিধান থাকতে পারে ! – সূরা মাঈদা (৫০)।

সুতরাং যে কোন সিদ্ধান্ত ও অনুশীলনের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা, সফলতা ও ভ্রষ্টতা নির্ধারণ করতে হবে এই মাপকাঠি দ্বারা এবং

এর উপর নির্ভর করেই তার সংশোধন ও সংস্কার করতে হবে, অমুসলিমদের বা অমুসলিম চিন্তা ও সংস্কৃতি প্রভাবিত কোন মুসলমানের চিন্তাপদ্ধতি ও পরিমাপক দ্বারা নয়। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন :

﴿ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ ﴾ المائدة: ٤٩

অর্থাৎ 'তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, তারা যেন, আল্লাহ আপনার নিকট যা নাযিল করেছেন, তার কোন কিছু থেকে আপনাকে বিচ্যুত করতে না পারে'– সূরা মাঈদা (৪৯)।

৩. মূল্যবোধ, বিধান, নানা বিষয়ের ধারণা, বিচারকাঠি, ইত্যাদি বিষয়ের মানব রচিত বিচার পদ্ধতিগুলোর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকা। মানবীয় এই সব চিন্তা ও বিচারপদ্ধতিগুলো, অনেক সময়ই, হাজির হয় ঝলমল মোড়কে। এবং অনেক ক্ষেত্রে তা – স্বীকার করতে দ্বিধা নেই– পূর্ণ বা খণ্ডিত সত্য ধারণ করতে পারে। কারণ নানা ভ্রষ্টতা সত্ত্বেও, বিচার-বিবেচনা ও সত্য চেনার ক্ষেত্রে মানুষের যে আদি-জন্মগত স্বভাব, মানুষের মাঝে সব সময় তার কিছু অবশিষ্ট থেকে যায়। সেই আদি ফিতরতের বলে বা বিশুদ্ধ-নিখাদ বুদ্ধি-যুক্তি দ্বারা মানুষ তার রচিত চিন্তা ও বিচার পদ্ধতিতে অনেক সময় সত্যকে পেতে সফল হয়। কিন্তু সচেতন থাকতে হবে, সব কিছুর পরও এই মেথডলজি সীমাবদ্ধ এবং আল্লাহ প্রদত্ব পদ্ধতির মত সর্বদিকে সুসঙ্গত নয়। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন :

﴿ وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخۡتِلَٰفٗا كَثِيرٗا ﴾ النساء: ٨٢

অর্থাৎ 'যদি তা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো পক্ষ থেকে হত তবে তাতে অনেক অসঙ্গতি পেত'– সূরা নিছা (৮২)।

মানুষ,মুসলমান কাফের নির্বিশেষে, আজ যে সব অনিষ্ট-অকল্যাণে আক্রান্ত হয়ে আছে তার কারণ এই সঠিক আল্লাহ প্রদত্ব উৎস থেকে বিচারপদ্ধতিগুলোর বিচ্যুতি। এই সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন :

﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ ﴾ الروم: ٤١ অর্থাৎ 'মানুষের নিজেদের কর্মের ফলেই জলে-স্থলে ফাসাদ ছড়িয়ে পড়েছে'। সূরা রোম (২১)। আল্লাহ আরো এরশাদ করেন :

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ الأنبياء: ٢٢

অর্থাৎ ' যদি আসমান ও জমিনে আল্লাহ ছাড়া অন্য আরো ইলাহ থাকত তাহলে তা ধ্বংস হয়ে যেত। সুতরাং তারা যা বলে আরশের রব তা থেকে পবিত্র'– সূরা আম্বিয়া (২২)।

৪. ইসলাম ধর্ম ন্যায় ও ইনসাফের ধর্ম,এই বিশ্বাস জাগরূক রাখা। আর ন্যায়পরায়নতা মানে সমমানের দুটি বিষয়ের মাঝে সমতা রক্ষা করা এবং অসম বিষয়গুলোর জন্য নিজ নিজ অবস্থা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন মান নির্ধারণ করা। ইসলাম নিঃশর্ত সমতা-সাম্যের ধর্ম, এই ধারণা ভুল। নিঃশর্ত সাম্যের ধারণা অনেক ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন মানের বিষয়কে সমমান দান করে, যা মূলত জুলুম ও অবিচার। তবে যারা ইসলাম সাম্যের ধর্ম বলতে, ইসলাম ন্যায়পরায়নতার ধর্ম বুঝাতে চান, তারা ধারণাগতভাবে সঠিক। কিন্তু তাদের ভাষাটি ভুল। কোরআন কোথাও নিঃশর্ত সাম্যের আদেশ করে নি। কোরআন, বরং, সব জায়গায়

ন্যায়পরায়নতার নির্দেশ দিয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন :

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ ﴾ النحل: ٩٠

অর্থাৎ 'আল্লাহ ন্যায়পরায়নতা ও এহছান (সর্বত্তোম উপায় অবলম্বন) এর আদেশ দেন'– সূরা নাহাল (৯০)। শরীয়তের বিধানগুলোর ভিত্তি হচ্ছে ন্যয়পরয়ানতা। সুতরাং সমতা রক্ষায় যেখানে ন্যায়বিচার হয় সেখানে শরীয়ত সাম্য রক্ষা করে আর যেখানে ভিন্নতা-তারতম্য করাই হয় ইনসাফের দাবি সেখানে

শরীয়ত তারতম্য করে। ইসলামে নিঃশর্ত সমতার কোন ধারণা নেই। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন :

﴿ وَتَمَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدۡقٗا وَعَدۡلٗاۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ﴾ الأنعام: ١١٥

অর্থাৎ 'আপনার রবের কালিমা পূর্ণ সত্য ও ইনসাফপূর্ণ। তার বাণীতে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ'– সূরা আনআ'ম (১১৫)। অর্থাৎ আল্লাহর কালিমা সত্য সংবাদ দান করে এবং ইনসাফপূর্ণ বিধান দেয়। তাই ইসলাম মানবীয় জীবন ও মানবীয় সম্পর্কগুলোকে যে এককের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তা 'ইনসাফ'। সবাইকে ইনসাফ করতে হবে, সবার সাথে এবং সর্বাবস্থায়। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন :

﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ ﴾ المائدة: ٨

অর্থাৎ 'কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদের অন্যায় করতে বাধ্য না করে। ইনসাফ করে যাও। কারণ সেটাই তাক্বওয়ার সবচেয়ে নিকটবর্তী'– সূরা মাঈদা (৮)।

৫. আধুনিক 'জাহেলিয়্যাত'-এর নাম পশ্চিম। সমকালীন এই জাহেলিয়্যাত মানবীয় সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রে যে মৌলিক চিন্তা ও মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে তার নাম ব্যক্তিতান্ত্রিকতা। ব্যক্তিতান্ত্রিকতা নির্ভর যে কোন ধরনের মানবীয় সম্পর্ক, পরিণতীতে, যৌক্তিক ও প্রকৃতিকভাবেই, চরম দ্বন্দ্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক, ব্যক্তিতান্ত্রিক ও স্বার্থপর হয়ে উঠে। পরস্পর দ্বন্দ্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ব্যক্তিতান্ত্রিকতা ও স্বার্থপরতা হয় এই সম্পর্কের মূল চালিকা শক্তি। পরস্পর সহযোগিতা ও সহমর্মিতা এবং আত্মত্যাগ ও পরার্থপরতা , এই সম্পর্কগুলোর এলকায় এই শব্দগুলোর কোন অর্থ থাকে না। এই পরিণতি কোন ধরনের মানবীয় সম্পর্কের জন্যই সুখকর নয়। কিন্তু ওহী নির্ভর চিন্তা ও বিচার পদ্ধতিবিচ্যুত পশ্চিম মানুষকে এর চেয়ে ভাল কিছু দিতে সক্ষম নয়। আজ জগৎ জুড়ে নারী-পুরুষের সম্পর্ক যে নির্মম দ্বান্দ্বিকতায় আক্রান্ত হয়ে আছে, তাদের উভয়ের অধিকার ব্যহত হচ্ছে তা মূলত পশ্চিমের ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রাকৃতিক ফলাফল। কারণ পশ্চিমের এই চিন্তা ও সংস্কৃতির আদি বীজ, যে মিথলজি বা পুরাণ, তা মনে করে নারী ও পুরুষ এই দুই লিঙ্গের মাঝে রয়েছে এক আদি দ্বন্দ্ব, এবং নারীই হচ্ছে মানুষের মহা আদি পাপের মূল কারণ। এই মিথলজি অন্য অনেক সভ্যতা ও

সংস্কৃতির সাথে সংযুক্ত হতে পারে। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত ও মুসলিম সংস্কৃতির সাথে এর আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই।

ইসলামী শরীয়তে মানুষকে যে অধিকার দিয়েছে, তার নির্ধারক নারী বা পুরুষ নয়। তার নির্ধারক আল্লাহ তায়ালা, যিনি সব কিছু সম্পর্কে সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী। এরশাদ হয়েছে :

﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَجَعَلَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا لِيَسۡكُنَ إِلَيۡهَاۖ ﴾الأعراف :١٨٩

অর্থাৎ 'তিনি ঐ সত্ত্বা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক নফস থেকে অতঃপর তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গিনীকে, যাতে সে তার নিকট প্রশান্তি পায়'– সূরা আ'রাফ (১৮৯)। অনেক মুসলিম সমাজে নারী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি অবিচার করছে। ক্ষুণ্ন হচ্ছে তাদের অধিকার। ইসলামের কোন ক্রুটির কারণে এ রূপ ঘটছে ব্যাপারটি আদৌ সেরকম নয়। এটা ইসলামের কোন সংকটও নয়। তার কারণ, বরং, সেই সমাজের মুসলমানদের নিজেদের দ্বীন থেকে বিচ্যুতি, ইসলামের বিধানাবলী সম্পর্কে অজ্ঞতা, রবের প্রতি তাদের ঈমানের দুর্বলতা। কিংবা দেখা যাবে সেই সমাজের মুসলমানরা মাবন রচিত কোন বিধান বা শরীয়ত বিরোধী স্থানীয় কোন প্রথা ও সংস্কারের অনুকরণ করার ফলে এই বিপদে আক্রান্ত হয়েছে।

৬. ইসলামের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শুরু হয়েছে মুসলমান ও কাফেরদের লড়াই। আজ ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার যে লড়াই চলছে তা, সেই অব্যাহত লাড়ইয়েরই ধারাবাহিকতা। এই নিরবধী লড়াইয়ের যে পর্বগুলোতে মুসলমানরা সাময়িকভাবে পরাস্ত হয় এবং কাফেররা তাদের উপর অধিপত্য করতে থাকে, সেই

পর্বগুলোতে মুসলমানদের মাঝে উদ্ভব ঘটে নানা ধরনের মুনাফেকীর। যে মুসলানদের মনে অসুস্থতা আছে, ঈমানে দুর্বলতা আছে, তাদের সে অসুস্থতা ও দুর্বলতা উম্মুক্ত হয়ে পড়ে। বেড়ে যায় ইসলামবিরোধী চিন্তা ও বক্তব্যের অনুগত মুসলিম শ্রোতা ও পাঠক। কাফেরদের সাথে সাথে এই মুনাফেক মুসলিম শ্রেণীও ইসলামের শত্রু। তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ التوبة: ٧٣

অর্থাৎ 'হে নবী আপনি কাফের ও মুনফেকদের সাথে জিহাদ করুন এবং তাদের উপর কঠোর হোন। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। এবং তা খুবই নিকৃষ্ট ঠিকানা'– সূরা তাওবা (৭৩)। আল্লাহ তায়ালা আরো এরশাদ করেন :

﴿ هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَٱحْذَرْهُمْ ۚ قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴾ المنافقون: ٤

অর্থাৎ 'তারাই শত্রু। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক হও। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন। বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় যাচ্ছে'!– সূরা মুনাফিকূন (৪)। এই মুনাফেকরা অধিকাংশ সময় বিভ্রান্তিকর ও প্রতারক ভাষা ব্যবহার করে। তারা বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে এবং তার মূল লক্ষ্য সম্পর্কে সংশয় তৈরি করে ইসলামী শরীয়তের উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা করে থাকে। ফলে তাদের ভাষা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে। সুতরাং এই সম্পর্কে মুসলামনদেরকে সতর্ক করা মুসলিম চিন্তাবিদদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এবং মুসলমানদের মধ্যে বস্তুগত ও চিন্তাগত পরাজয়ের প্রভাবে

ইসলাম ও তার শরীয়ত ও বিধানের প্রতি যাদের আস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে ইসলাম বিরোধী চিন্তা ও ডিসকোর্সের প্রতি মনযোগ বেড়ে যায় এবং ফলে তাদের মনে নানা সংশয় বিকশিত হয়, তাদেরকে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাষায় নসিহত করাও সমান গুরুত্বের দাবি রাখে।

দ্বিতীয়ত
নারীর অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে
ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি

ইসলামী ইতিহাসের দেড় হাজার বছরের দীর্ঘ জীবনে কখনোই, তার শক্তি ও বিজয় বা দুর্বলতা ও পরাজয়, কোন পর্বেই, মুসলিম সমাজে এমন কোন সংকট দেখা দেয় নি যার নাম 'নারী ইস্যু'। কিন্তু পশ্চিম ও পশ্চিমা-ভাবাপন্ন পশ্চিমের মিত্ররা যখন তাদের অসুস্থতা ও সংকটগুলো নিয়ে ইতিহাসে আবির্ভূত হল, যাতে আন্যদের সাথে সাথে আক্রান্ত হল মুসলমানরাও – তখনই উদ্ভূত হল সেই কল্পিত সংকট, যার নাম 'নারী ইস্যু'। ইসলামী সমাজে ও ডিসকোর্সে এটা কোন সংকট নয়, তাই ইস্যুও, নয়। যে মুসলিম সমাজ ও ডিসকোর্সগুলোতে এই বিষয়টি আলোচিত হয়, তার অধিকাংশই মূলত বিষয়টিকে গ্রহণ করেছে ধর্মহীন পাশ্চিমা অর্থে।

সুতরাং বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি তা নির্ধারণ করা জরুরী। এখানে আমরা নারীর অধিকার ও ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্বের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তের মূলনীতিগুলো আলোচনা করছি :

১. মূল যে দুই অংশ দ্বারা গড়ে উঠেছে মানব প্রজাতি, নারী তার একটি। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন :

﴿ وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوۡجَيۡنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰ ﴾ النجم: ٤٥

অর্থাৎ 'তিনি সৃষ্টি করেছেন যুগল : পুরুষ ও নারী'– সূরা নাজম (৪৫)। দুই অঙ্গে গড়া নফসের একটি অঙ্গ নারী। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ﴾ النساء: ١

অর্থাৎ 'হে মানুষ তোমরা তোমাদের রবের তাক্বওয়া অবলম্বন কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফস থেকে এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গীকে'– সূরা নিছা (১)। সুতরাং আদি সৃষ্টি, মাঝের জীবৎকালের দায়িত্ব এবং পরিণতি, সর্ব ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমমানের সঙ্গি। জীবন, সমাজ জগৎ বিনির্মাণে তারা উভয়েই অংশ গ্রহণ করে এবং আপন আপন বৈশিষ্ট অনুসারে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে। ধর্মের ক্ষেত্রে বিশ্বাস, সাওয়াব, আযাব, কোন ক্ষেত্রেই, এবং শরীয়তে দেওয়া অধিকার ও দায়িত্ব, কোন এলাকাতেই পুরুষ ও নারীর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ তায়ালা

এরশাদ করেন :

﴿ مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ﴾ النحل:٩٧

অর্থাৎ 'মোমেন পুরুষ অথবা নারী সৎ কর্ম করলে আমি তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের থেকে উত্তম বিনিময় দান করব'– সূরা নাহাল (৯৭)। আবু দাউদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন :

إنما النساء شقائق الرجال

অর্থাৎ 'নারীরা পুরুষের অর্ধাঙ্গ' – আবু দাউদ। এই সাম্য চেতনার কারণেই ইসলাম নিছক লিঙ্গের ভিত্তিতে কারো মর্যাদা নির্ধারণ করে নি বরং ইসলামের নিকট মর্যাদার পরিমাপক তাক্বওয়া। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন :

﴿إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ﴾ الحجرات: ١٣.

অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তি সে যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকি'– সূরা হুজরাত (১৩)। নারী ও পুরুষের অর্থবহ কোন সমতা-ভাবনা প্রকাশ করার জন্য 'তোমরা একে অপরের অংশ'। এর থেকে সূক্ষ্ম ও অর্থবোধক কোন ভাষিক প্রকাশ থাকতে পারে না।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন :

﴿فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٖ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰۖ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۖ﴾ آل عمران: ١٩٥

অর্থাৎ 'তখন তাদের রব তাদের ডাকে সাড়া দিলেন যে, আমি তোমাদের নারী-পুরুষ কারো কোন আমল ব্যর্থ করব না, তোমরা একে অপরের অংশ'– সূরা আলে ইমরান (১৯৫)। সুতরাং

মানবিকতায়, ধর্ম ও শরীয়তের বিধান মালায়, এবং আল্লাহর নিকট মর্যাদার বিচারে নারী-পুরুষ সমান।

বিশেষ এক হিকমতে আল্লাহ তায়ালা নারী ও পুরুষকে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ও শারীরিক গঠন দান করেছেন। শারীরিক গঠনের তারতম্যের কারণে নারী ও পুরুষের শারীরিক, মানসিক ও মনস্ত াত্ত্বিক শক্তি ও স্বভাব এক নয়। উভয়ের মধ্যে তারতম্য আছে। শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে প্রাকৃতিকভাবে নারী-পুরুষ অভিন্ন নয়। আল্লাহ তায়ালা পুরুষ সম্পর্কে বলেছেন :

﴿ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَىٰ ﴾ آل عمران: ٣٦

অর্থাৎ 'পুরুষ তো নারীর মত নয়'– সূরা আলে ইমরান (৩৬)। এবং নারী সম্পর্কে বলেছেন:

﴿ أَوَمَن يُنَشَّؤُاْ فِى ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ الزخرف: ١٨

অর্থাৎ 'যে অলংকারের মাঝে লালিত হয় এবং যে তর্কে অস্পষ্ট '– সূরা যুখরুফ (১৪)।

শরীয়তের কিছু বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের এই গঠনগত ও প্রকৃতিগত ব্যবধানের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে ,নারী ও পুরুষের জন্য, তাদের নিজস্ব গঠন ও প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন বিধান ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। শরীয়তের বিধানদাতা আল্লাহ তায়ালা তার হিকমাত সর্বজ্ঞানী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তায়ালার অমোঘ হিকমাতের দাবি অনুযায়ী তা করা হয়েছে। কোরআনের এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴾ الأعراف: ٥٤

অর্থাৎ জেনে রাখ, সৃজন ও আদেশ তারই, জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ বরকতময়'– সূরা আ'রাফ (৪৫)। ওটা হল আল্লাহ তায়ালার মহাবৈশ্বয়িক সৃষ্টি, নির্মাণ, নির্ধারণ বিষয়ক ইচ্ছা, আর এটা হল নির্দেশ, বিচার, বিধান প্রণয়নে আল্লাহ তায়ালার দ্বীন ও শরীয়ত বিষয়ক ইচ্ছা। নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে– সৃষ্টিজগতের স্বার্থ, পৃথিবীর নির্মাণ-কর্ষণ, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সৃঙ্খলা বিধান এসবের আলোকে– এ উভয় ইচ্ছা একত্রিত হয়েছে।

২. এই অনড় বাস্তবতার উপর ভিত্তি করেই বিন্যস্ত হয়েছে ইসলামী শরীয়তের অনেকগুলো বিধান, যার অন্যতম পরিবার বিষয়ক বিধানাবলী। ইসলামের ভাবনায় পরিবার সমাজ সংগঠনের একক। পরিবারের সুসম বিন্যাস, শক্তি ও টিকে থাকার উপরই নির্ভর করে সমাজের সুস্থতা ও নিরাপত্ত্বা। পরিবার তার সদস্যদের মধ্যে প্রশান্তি, ভালবাসা ও সহমর্মিতার পরস্পর বিনিময় নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালনের লক্ষ্য স্থির করে থাকে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন :

﴿ وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾
الروم: ٢١

অর্থাৎ 'তার অন্যতম নিদর্শন : তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন সঙ্গিনী, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও। এবং তিনি তোমাদের মাঝে দিয়েছেন ভালবাসা ও দয়া'– সূরা রূম (২১)।

সমকালের পশ্চিমা জাহেলিয়্যাত নির্বোধের মত নারীর পারিবারিক ভূমিকাকে হালকা করে দেখে, তুচ্ছ মনে করে নারীর পারিবারিক এই দায়িত্বকে। যে কোন সুস্থ সমাজকে অবশ্যই এই চিন্তা মোকাবেলা করতে হবে। ইসলাম তো মনে করে পরিবার ও পরিবার সংক্রান্ত দায়িত্বগুলোই হচ্ছে মুসলিম নারীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। নারী যদি এই দায়িত্ব পালন করে তাহলে তাই হবে সমাজের জন্য, সবার জন্য, মঙ্গলকর।

সামাজিক দায়িত্ব বন্টনে ইসলামী শরীয়ত, অপর দিকে, পুরুষকে দিয়েছে পরিবারের তত্বাবধান ও অবিভাকত্বের দায়িত্বগুলো। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন :

﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ ﴾ النساء: ٣٤

অর্থাৎ ‘পুরুষ নারীর দায়িত্বশীল। কারণ আল্লাহ তাদের একের উপর অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং এ-কারণেও যে পুরুষরা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে ’– সূরা নিছা (৩৪)। আল্লাহ তায়ালা আরো এরশাদ করেন :

﴿ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ ﴾ البقرة: ٢٢٨

অর্থাৎ ‘নারীর উপর পুরুষের যেমন তেমনি, নীতি অনুযায়ী, পুরুষের উপরও নারীরও অধিকার রয়েছে। তবে নারীদের উপর রয়েছে পুরুষদের একস্তর শ্রেষ্ঠত্ব ’ – সূরা বাক্বারা (২২৮) ‘কিওয়ামাহ’ বা পারিবারিক অবিভাকত্বের মানে ক্ষুদ্র সমাজের অর্থাৎ পরিবাবের নেতৃত্ব দেওয়া-পরিচালনা করা। স্বেচ্ছাচারিতা ও অধিপত্যকামী মনোভাব থেকে মুক্ত হয়ে পুরুষকে নেতৃত্বের

এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই দায়িত্ব আদায়ের মাধ্যমে পুরুষ, নারী এবং পরিবারের কল্যাণে, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন পুরুষ পরিবারের আর্থিক ব্যয়ভার বহন করে, তার নিরাপত্বার দায়িত্ব নেয়, পরিবারের যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। সুতরাং নেতৃত্বমূলক কোন দায়িত্ব স্বার্থকভাবে পালন করার জন্য নেতার প্রতি যতটুকো আনুগত্য জরুরী স্বাভাবিক পুরুষ তা পাবে। তবে আনুগত্য হবে কল্যাণ কাজে। ইসলাম নিঃশর্ত আনুগত্যের নির্দেশ দেয় নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

إنما الطاعة في المعروف

অর্থাৎ ‘আনুগত্য হবে কল্যাণ কাজে কিংবা সঠিক বিচার অনুসারে ’– বোখারী ও মুসলিম।

৩. নারীর আর্থিক ব্যায়ভার গ্রহণ করা পুরুষের দায়িত্ব। পুরুষের সম্পত্তির একটি ভাগ, এই অধিকার বলে, নারীর প্রাপ্য। এই দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হলে পুরুষ কখনোই তা এড়াতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করনে :

﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ الطلاق:٧

অর্থাৎ ‘স্বচ্ছল ব্যক্তি যেন তার সচ্ছলতা অনুসারে খরচ করে। আর যার সক্ষমতা সীমিত সে যেন, আল্লাহ তাকে যা দান করেছেন, তা থেকেই খরচ করে। আল্লাহ কোন ব্যক্তির উপর তাকে যতটুকো সাধ্য দিয়েছেন তার বাইরে কোন কিছু চাপিয়ে দেন না। অচিরেই আল্লাহ অসচ্ছলতার পর সচ্ছলতা দান করবেন’– সূরা তালাক (৭)। স্বামীর পক্ষ থেকে আর্থিক ব্যয় লাভ নারীর অধিকার। এবং

তার নিজস্ব সম্পত্তির মালিকানা ও ব্যবহারের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। নিজস্ব সম্পত্তির মালিকানা এবং তার ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মত স্বাধীন, অভিন্ন ক্ষমতার অধিকারী। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্তও পশ্চিমা জাহেলিয়্যাত নারীকে স্বাধীন উপার্জন এবং নিজস্ব মালিকানা ও ব্যবহারের অধিকার দেয় নি। রোমান আইনে নারীকে এই অধিকার দেওয়া হয় নি। উপার্জন, সম্পদের মালিকানা এবং তার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে। এই ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে কোন ফারাক নেই।

ইসলাম নারী-পুরুষের সম্পর্ক এবং তাদের পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব নির্ধারণ ও বন্টন করেছে সম্পূরুক পদ্ধতিতে। অর্থাৎ নারী তার নির্ধারিত দায়িত্ব আদায়ের মাধ্যমে পুরুষকে সম্পূর্ণতা দান করবে অনুরূপ পুরুষ সম্পূর্ণতা দান করবে নারীকে। এই সম্পূরক কর্তব্য বন্টনের অন্যতম লক্ষ্য নারীর সান্নিধ্যে পুরুষের 'ছাকান' বা প্রশান্তি লাভ এবং উভয়ের মাঝে ভালবাসা ও সহমর্মিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন :

﴿ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ الروم: ٢١

অর্থাৎ 'তার নিদর্শনসমূহের অন্যতম হচ্ছে তিনি তোমাদের নফস থেকেই তোমাদের সঙ্গিনীদের তৈরি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি পেতে পার। এবং তোমাদের দিয়েছেন ভালবাসা ও দয়া'– সূরা রূম (২১)। এখানে ব্যবহৃত 'সাকান' শব্দটি খুবই ব্যাপক অর্থবোধক। এই ক্ষেত্রে, এই অর্থ উৎপাদনের

জন্য আরবীতে– সম্ভবত অন্য কোনো ভাষাতেও– এর চেয়ে ভাল আর কোন শব্দ নেই। শব্দটির মাঝে অনেকগুলো অর্থ একত্রিত হয়েছে, উদাহরণত নিরাপত্বা, শান্তি, প্রশান্তি, আপনত্বের অনুভূতি ইত্যাদি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মাঝে যদি এই গুণগুলো বিকশিত হয় তাহলে এর সুফল ভোগ করে, সর্বপ্রথম স্বামী-স্ত্রী নিজেই, এরপর সন্তানরা এভাবে গোটা সমাজ।

আমরা আগেই দেখিয়েছি নারী-পুরুষ সৃষ্টিগতভাবেই এক নয়। তাদের মাঝে শারীরিক ও মানসিক অনেক ফারাক আছে। নারী-পুরুষের পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব বন্টনের ক্ষেত্রে ইসলাম এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখেছে এবং তাদের নিজ নিজ প্রাকৃতিক-জৈব বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতার সাথে সঙ্গতি রেখে সম্পূরক পদ্ধতিতে তাদের দায়িত্ব বন্টন ও অধিকার নির্ধারণ করেছে। মানবিক সম্পর্ক বিনির্মাণে ইসলাম ন্যায় ও ইনসাফের যে ভিত্তি দিয়েছে এটা তারই ফল।

যার যে স্বাভাবিক দায়িত্ব, সম্পূরক সমাজিক দায়িত্বের ক্ষেত্রে, তাকে তার থেকে বেশী দায়িত্ব দেওয়া হলে বা স্বেচ্ছায় তার থেকে বেশী দায়িত্ব নিলে অনেক সময় তার দ্বারা সমাজ উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার কারণ তার ফলে সামাজিক সংগঠন ব্যাহত হয়। তাই ব্যক্তিগত ও সামাজিক কোন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া নারীর উপর পুরুষের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়, এক প্রকার জুলুম। এটা দায়িত্ব বন্টন ও অধিকারের সুসঙ্গতাকে নষ্ট করে। এর মাধ্যমে নারীর সম্মান বিদীর্ণ করা হয়। নারীর নারীত্বকে অপদস্থ করা হয়।

৫. ব্যক্তি জীবন, সমাজ জীবন এবং ব্যাপকভাবে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে নারীর দায়িত্ব কি, তা স্পষ্ট করা এবং সে সম্পর্কে

সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে যে বিষয়টি অনিবার্য পূর্বশর্ত তা হল - শিক্ষা। তাই আমরা মনে করি, যা ছাড়া মানুষ তার রবের এবাদত পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করতে পারবে না–যেমন বিশ্বাস ও অনুশীলনের অনিবার্য বিষয়গুলো– সেই সব বিষয়ে শিক্ষাদান একটি অনিবার্য শরীয়তী নির্দেশ এবং সেই ক্ষেত্রে নারী-পুরুষে কোন ফারাক নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন :

طلب العلم فريضة علي كل مسلم

অর্থাৎ 'জ্ঞান অন্বেষণ প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ'– ইবনে মাজা। ইসলামের এই মৌলিক বিধানগুলোর বাইরের অন্যান্য বিধানের জ্ঞানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের যে নিজ নিজ ভূমিকা ও দায়িত্ব সে অনুসারে জ্ঞান অর্জন করবে। এর বাইরের যে জ্ঞান চর্চা তা নফল, তা আদায় করতে গিয়ে পার্থিব ও অপার্থিব ফরজ আমলগুলো ব্যহত করা যাবে না।

৬. ইসলাম নরীর অধিকারগুলো নির্ধারণ করেছে তার জৈব ও প্রাকৃতিক স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের সাথে সঙ্গতি রেখে। পক্ষান্তরে জাতীসংঘ মানুষের অধিকারের যে সনদ পেশ করেছে তাতে নারীর অধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে একটি অনুরূপ সাম্যতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে। ইসলাম নারীকে যে সব অধিকার দেয় এবং জাতিসংঘের এই অধিকার সনদে নারীর জন্য যে সব অধিকারের কথা বলা হয়েছে এই দুয়ের তুলনামূলক পাঠ নিলে দেখা যাবে ইসলাম নারীকে যে সব সামাজিক অধিকার দিয়েছে তা জাতিসংঘের দেওয়া অধিকারগুলো থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এই অধিকারগুলো সম্পর্কে পশ্চিমা জাহেলিয়াত উদাসীন। তাই কোনরূপ দ্বিধা না করে সে এইগুলো এড়িয়ে যায়, অকার্যকর করে

দিতে চায়। উদাহরণত বিয়ে, মাতৃত্ব, গৃহ পরিচালনা এবং পারিবারিক অবকাঠামোর মধ্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলো অনুশীলন ও বিকশিত করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত নারীকে যে অধিকার দিয়েছে, আধুনিক জাহেলিয়াতের বিধান-সনদে তা নেই।

ইসলাম নরীকে স্বামী নির্বাচনের অধিকার দিয়েছে। এই ক্ষেত্রে রাসূল স্বামীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে দিয়ে তার সাহায্যে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দিয়েছে নারীকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন :

إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه

অর্থাৎ 'যার চরিত্র ও দ্বীনদারি তোমরা পছন্দ কর , তোমাদের নিকট যদি এমন কেউ আসে তাহলে তার নিকট বিয়ে দাও'–ইবনে মাজা। কোন কারণে দাম্পত্য জীবন যদি সংকটের মুখে পড়ে তাহলে শরীয়ত নারীকে স্বামীর সাথে না থাকার অধিকার দিয়েছে। এই ক্ষেত্রে কোরআনে অনেক আয়াত ও সহীহ ও স্পষ্ট হাদীস আছে। এই বিষয়ে যে কোন বিধান সেগুলোর সাপেক্ষেই নির্ধারিত হওয়া উচিত।

নারীর সম্ভ্রম ও মর্যাদা রক্ষা ইসলামী শরীয়তের একটি বিধান। যে পাঁচটি বিষয় শরীয়তের সামাজিক বিধান গুলোর মূল, অর্থাৎ দ্বীন, মর্যাদা, আক্বল, মাল, নারীর মর্যাদা রক্ষা তার অন্যতম। কোন ভাবে নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা মানে শরীয়তের বিরুদ্ধে যাওয়া, নারী-পুরুষ, পরিবার ও সমাজের অধিকার লংঘন করা। এবং তা মোমেনদের মাঝে অশ্লিলতা ছাড়ানোর অপরাধ বলে বিবেচিত হবে, যার সম্পর্কে কোরআনে এসেছে :

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ النور: ١٩

অর্থাৎ 'যারা মোমেনদের মাঝে অশ্লিলতা ছড়াতে চায় তাদের জন্য দুনিয়া আখেরাতে রয়েছে যন্ত্রণাকর শাস্তি। আল্লাহ জানেন তোমরা জান না'– সূরা নূর (১৯)। ইসলামের সমাজ ভাবনা ও বিধানে এটি মৌলিক একটি বিষয়। এই মৌলিক বিষয়টিকে রক্ষা করার জন্য ইসলাম অনেকগুলো বিধান দিয়েছে। যেমন ইসলাম অনেক গুরুত্বের সাথে বিয়ের বিধান দিয়েছে এবং বিয়ের চুক্তিকে বলেছে 'কঠিন প্রতিশ্রুতি'। যেমন কোরআনে এসেছে:

﴿ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴾ النساء: ٢١

অর্থাৎ 'আমি তোমাদের কাছ থেকে নিয়েছি কঠিন প্রতিশ্রুতি'– সূরা নিছা (২১)। এই মূল বিষয়টি যেন ব্যহত না হয় তাই ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়ের উপর সমভাবে যিনা হারাম করেছে। কোরআনে এসেছে :

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴾ الإسراء: ٣٢

অর্থাৎ 'তোমরা যিনার নিকটেও যেও না। কারণ তা অশ্লীল এবং খুবই খারাপ পথ'– সূরা ইছরা (৩২)। যে সব বিষয় ব্যক্তি ও সমাজকে ব্যভিচারের দিকে নিয়ে যায় ইসলাম তা বন্ধ করে দিয়েছে। বিবাহ বন্ধন হারাম নয় এমন নারীর সাথে নির্জন ও ঘনিষ্ঠ মেলামেশা-কথাবার্তা নিষিদ্ধ। সমাজে যে কোন ধরনের অশ্লীলতা ছড়ানোকে কঠিনভাবে বাঁধা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে এবং গুরুত্বের সাথে প্রণয়ন করছে হিজাব ও এই সংক্রান্ত বিধানগুলো। এবং যারা এই বিষয়টি ক্ষুণ্ন করে তাদের জন্য

ইসলাম দিয়েছে শাস্তির বিধান । এই উদ্দেশ্যেই ইসলামে যিনার কঠিন শাস্তি-বিধানগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। এভাবে ইসলাম নারীর সম্ভ্রব ও মর্যাদা রক্ষার বিষয়টিকে নানাভাবে গুরুত্ব দিয়েছে।

সম্ভ্রম ও শালীনতা রক্ষা এবং অশ্লীলতার বিস্তার রোধের জন্য ইসলামী শরীয়ত যে কয়টি সামাজিক দূর্গ নির্মাণ করেছে তার অন্যতম হল হিজাব। কেবল তাই নয় বরং হিজাব নারী ও পুরুষের সম্ভ্রম-মর্যাদার প্রতি যত্নবান শরীয়তের অন্যতম প্রতীক।

হিজাব কোন নফল বিধান নয়। কিংবা হিজাব ঐচ্ছিক প্রতীকী কোন অনুশীলন নয় যে, কারো মনে চাইলে তা পালন করবে বা করবে না। বরং নারীর মান-সম্ভ্রম রক্ষা করার একটি উপায় হিসেবে আল্লাহ নারীদের উপর হিজাব ফরজ করেছেন। এর ফলে কাম ও প্রবৃত্তির অনুসারী দুষ্টরা তাদের উত্তক্ত করতে পারবে না। এটি অবশ্যপালনীয় ফরজ বিধান। নারীদের আদর্শ 'উম্মাহাতুল মোমেনীন' এর উপরও তা ফরজ ছিল। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ﴾ الأحزاب: ٥٩

অর্থাৎ 'হে নবী আপনি আপনার স্ত্রী ও কন্যা এবং মোমেন নারীদের বলুন তারা যেন হিজাব দিয়ে ঢেকে থাকে। তাহলে তাদের চিনা যাবে না এবং তাদেরকে কেউ উত্যক্ত করবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল দায়ালু'– সূরা আহযাব (৫৯)।

ইসলামের শত্রুরা এবং প্রবৃত্তির অনুসারী ও মানুষের কামুক বৃত্তিগুলো ভাঙ্গিয়ে যারা বাণিজ্য করে তারা ইসলামী হিজাবকে খুবই নগ্নভাবে হামলা করে থাকে। আবার অনেক সমাজ ও ডিসকোর্স হিজাব গ্রহণ করে নেয়। তবে অন্তসার ও লক্ষ্যশূন্য জাতীগত একটি প্রথা হিসেবে। বাহ্যত হিজাব পালন করলেও এরা হিজাবের মিত্র নয়। হিজাবকে সরাসরি অস্বীকারের সাথে এর মৌলিক কোন তফাত নেই। দুটিই ইসলামী শরীয়ত ও হিজাবের শত্রু।

কিন্তু শরীয়ার বিধান হিসেবে তো অবশ্যই, হিজাব এবং তার সাথে সম্পৃক্ত মূল্যবোধ– আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি– যে কোন মাবনীয় সমাজের সুস্থ্য জীবনের জন্যও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিশ্ব জুড়ে হিজাবের প্রতি এত বিদ্বেষ কেন ? উদাহরণত পশ্চিম, বিস্ময়করভাবে, হিজাবের ক্ষেত্রে খুবই সংকীর্ণ আচরণ করে। হিজাব নিয়ে তারা খুবই শংকিত ও বিব্রত বোধ করে। আর কোন ধর্ম-সম্প্রদায় বা মাবন-গোষ্ঠীর পোষাক নিয়ে পশ্চিমকে এমন সংকীর্ণ আচরণ করতে দেখা যায় না। পশ্চিমের দেশগুলো এবং পশ্চিম আক্রান্ত ধর্ম নিরপেক্ষ মুসলিম দেশগুলোতেও আইন ও বাস্তব আচরণ, উভয় উপায়ে হিজাবকে নানাভাবে আক্রমন করা হচ্ছে। এর কারণ কি ? – তা নিয়ে ভাবলে আমাদের নিকট অনেক কিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে।

হিজাব, পূর্বে আমরা প্রমাণ করেছি, ইসলামী শরীয়তের একটি মৌলিক ফরজ। ইসলাম এই বিধান দিয়েছে নারী ও সমাজের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য, নারীর সম্ভ্রমকে সমর্থন করার জন্য। শরীয়তের অপর যে বিধানটি এই লক্ষ্যের সাথে জড়িত এবং তাকে শক্তি যোগায় তা বহু বিবাহ। তবে বিকৃত প্রচারণা এবং ভুল অনুশীলন-চর্চার ফলে এই বিধান তার মূল জায়গা থেকে সরে

গিয়েছে। তার আবেদন হারিয়ে ফেলেছে। বাস্তবতার পাঠ নিলে দেখা যাবে যে সমাজ, এমনকি যে সব অমুসলিম সমাজ এই প্রথার চর্চা করে তাতে নারীর মর্যাদা ও মূল্য তুলনামূলক ভাল। যাতে এই প্রথার অনুশীলন ও প্রচলন আছে এবং যা এই বিধানকে অবৈধ ও অপরাধমূলক মনে করে, এই দুই সমাজের তুলনামূলক পাঠ নিলেই এই সত্য উন্মোচিত হয়ে যাবে। দেখা যাবে দ্বিতীয় সমাজেই নারী তুলনামূলক কম মূল্য পাচ্ছে।

তাই বহু বিবাহ ইসলামী শরীয়তের একটি স্বীকৃত বিধান। ক্ষুণ্ন নয়, এই বিধান নারীর মর্যাদাকে আরো নিশ্চিত করে। বৈধব্য, তালাক, পৌঢ়ত্ব/বিবাহহীনতার কারণে মেয়েদের আইবুড়ো হয়ে উঠা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর মর্যাদার সাথে বিয়ের যে সংকট দেখা দেয় বহু বিবাহ বিধান সে সংকটের সহজ সমাধান করতে পারে। বহু বিবাহ প্রথা আরো অনেক সমাজিক সংকটের তুলনামূলক সহজ ও কার্যকরী সমাধান। যেমন বন্ধ্যাত্ব, অসুস্থতা, পেশা-প্রকৃতি কিংবা জাতীয়তার মত আইনগত সংকট। এই সব ক্ষেত্রে বহু বিবাহ ছাড়া অন্য যে সমাধানটি আছে তা তালাক, ইসলামের ভাবনায় তা নিকৃষ্টতম বৈধ বিধান, যা ইসলামের দাম্পত্য বিধানের মূল স্পিরিট– পরস্পর ভালবাসা, মায়া–তার বিরোধী। অনেক ক্ষেত্রে বহু বিবাহ শিশুর অভিভাবকহীনতার সমাধান হয়ে থাকে। যেমন বাবা মারা-যাওয়া শিশু, বা বাবা-নিখোঁজ শিশুর ক্ষেত্রে বিকল্প পিতা-অভিভাবক তৈরি করে বহু বিবাহ প্রথা শিশুকে অনাথ এতীমী জীবন থেকে উদ্ধার করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন :

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴾ النساء: ٣

অর্থাৎ ‘আর যদি আশংকা কর যে, এতীমদের ক্ষেত্রে ইনসাফ করতে পারবে না তাহলে পছন্দমত দুই তিন বা চার নারী বিয়ে কর। যদি আশংকা হয় যে, ইনসাফ রক্ষা করতে পারবে না তাহলে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। এটাই অন্যায় পক্ষপাতে আক্রান্ত না হওয়ার সবচেয়ে ভাল উপায়’– সূরা নিছা (৩)। এভাবে বিয়ের বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইসলাম নারী, পুরুষ তথা গোটা সমাজের কল্যাণের প্রতি সযত্ন মনযোগ দিয়েছে। এমন বিধান দিয়েছে যা উভয় পক্ষের জন্য দাম্পত্য জীবনের লক্ষ্যকে পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত করে এবং তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদা পুর্ণ করে।

তৃতীয়ত
সনদের অভিমত

১. মানুষ হিসেবে মানুষের যে সম্মান প্রাপ্য এবং যে অধিকারগুলো মানুষের মানবিক অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত সে ক্ষেত্রে এবং ব্যাপকভাবে ধর্ম ও শরীয়তের বিধানাবলীর ক্ষেত্রে ইসলাম নারী-পুরুষের সমতা-অভিন্নতার কথা বলেছে এবং সাম্যমূলক বিধান

দিয়েছে। কিন্তু প্রাকৃতিক ও জন্মগতভাবেই নারী পুরুষ অনুরূপ ও অভিন্ন নয়। নারী-পুরুষের মাঝে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও জৈব এবং শারীরিক পার্থক্য রয়েছে। তার প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের দায়িত্ব ও অধিকার নির্ধারণের সময় যার যার প্রকৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে ভিন্ন ভিন্ন বিধান দিয়েছে, যাতে উভয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে। নারীবাদী ডিসকোর্স ও আন্তর্জাতিক নারী সংগঠনগুলো এবং মুসলিম দেশগুলোতে তাদের অনুসারীরা নারীর সমান অধিকার নিয়ে যে হৈ চৈ করে, নারী-পুরুষের অভিন্ন সাম্যের শ্লোগান দেয়, তা কাল্পনিক, অপ্রাকৃতিক এবং খুবই অবাস্তব।

মৌল মানবিক ক্ষেত্রগুলোয় সমতা ও সমান অধিকার খুবই প্রাকৃতিক এবং ন্যায্য দাবি। কারণ নারী-পুরুষ হচ্ছে সেই দুই অঙ্গ যার মাধ্যমে মনুষ্যঅস্তিত্ব পূর্ণতা লাভ করে। ইসলাম সুস্পষ্ট ও অকাট্যভাবে এই অধিকার নিশ্চিত করেছে। কিন্তু জীবনের যাবতীয় দায়িত্ব ও আদায়ের পদ্ধতির ক্ষেত্রে সমতা রক্ষার দাবি কি স্বাভাবিক?, তা বাস্তবায়ন কি সম্ভব ? নারী আন্দোলন, সংগঠন এবং নারীবাদীরা কি, সভা সেমিনার, তার শিল্প ও বিজ্ঞানসম্মত বক্তৃতা ও লেখালেখি দ্বারা বদলে দিতে পারেন বস্তুর ধর্ম-প্রকৃতি, মানুষের মৌল স্বভাব ? ইসলামের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তা একটি বাস্তব সম্মত ধর্ম ও বিধান। তার স্বভাব অনুসারে নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রেও ইসলাম বাস্তবতা এবং তাদের মৌল বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই বিধান দিয়েছে। সমতা যেখানে মৌল স্বভাবের দাবি সেখানে সমতা রক্ষা করেছে আর যেখানে ফারাক করাই বাস্তবতা, ফিতরাত বা মৌল স্বভাবের দাবি সেখানে ফারাক করেছে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন :

﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ الملك: ١٤

অর্থাৎ 'যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না ? তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত'– সূরা মুলক (১৪)।

সমাজের প্রকৃতি এবং মানুষের মৌল স্বভাবের বিরুদ্ধে গিয়ে পরিচালিত যে কোন আন্দোলন ও তৎপরতার একমাত্র পরিণতির নাম করুণ ব্যর্থতা। দীর্ঘ দেড় যুগ অতিবাহিত হওয়ার পরও, এমনকি পশ্চাত্য সমাজেও যে নারীবাদী আন্দোলনগুলো তাদের প্রত্যাশা পূরণে সফল হয় নি এটিই তার কারণ, এই দাবি-প্রত্যাশা প্রকৃতিবিরোধী। এ থেকেই আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি মুখরোচক এত শ্লোগান থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য সমাজে নারীবাদ বিরোধী নানা সংগঠন-আন্দোলন কেন গড়ে উঠছে, যারা নারীবাদের ধ্বংসাত্মক ফলাফলগুলো দেখিয়ে দিচ্ছে। তার প্রতিরোধ করছে। সুতরাং ইসলামী সমাজগুলোর জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে পাশ্চাত্য সমাজের এই পরিণতি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা এবং তারা যেখানে শেষ করেছে সেখান থেকে শুরু করা, যেখান থেকে তারা শুরু করেছিল সেখান থেকে নয়। ইসলাম নারীর ক্ষেত্রে যে বিধান দিয়েছে তাই যে হিকমতপূর্ণ, মুসলিম সমাজগুলো পাশ্চাত্যের নারীবাদের এই পরিণতি থেকে সেই অনুভূতিকে শক্তিশালী করতে পারে। এই ইতিহাস হতে পারে তার একটি বাস্তব প্রমাণ।

যা নারীর অধিকারকে ব্যাহত করে বা তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে, ইসলামী শরীয়ত নারীর বিরুদ্ধে এমন যে কোন পক্ষপাতমূলক আচরণ ও ধারণাকে হারাম মনে করে। নারীর বিপক্ষে এবং পুরুষের স্বপক্ষে অন্যায় কোন পক্ষপাত ইসলামী চিন্তা পদ্ধতি ও বিধানাবলীতে নেই। এগুলো মানসিকভাবে পরাজিত বা ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের ভুল ধারণা। যারা নারী পুরুষের

প্রকৃতি ও জৈব পার্থক্যগুলো জানে না এবং তার ভিত্তিতে ইসলাম কোন কোন শরীয়তী বিধান এবং জীবনের কোন কোন দায়িত্ব ও অধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে ফারাক করেছে, তা বুঝতে পারে ন,া তারাই এই ধরনের বিভ্রান্তিতে আক্রান্ত হয়। এর বাইরে নারীর বিরুদ্ধে ইসলামের পক্ষপাতের যে কোন দাবি– তা করতে পারে সচেতন শত্রু বা অজ্ঞ বন্ধু– মূলত অজ্ঞতা বা ভ্রান্ত যুক্তি নির্ভর।

নারীর বিরুদ্ধে ইসলামের অন্যায় পক্ষপাতের নানা উদাহরণ দেওয়া হয়। তার অন্যতম : মিরাসের ক্ষেত্রে, মিরাসের উৎসের সাথে অভিন্ন আত্মীয়তা সত্ত্বেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর জন্য পুরুষের অর্ধেক মিরাস নির্ধারণ। এই চিন্তা নারী-পুরুষের অনুরূপ সাম্যের পশ্চিমা ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং যে সুসম ইনসাফ ধারণার উপর ইসলাম মানবিক সম্পর্কগুলো সাজিয়েছে তা বুঝতে অক্ষম। এই ইনসাফ-ভাবনার দাবি, নারী ও পুরুষের অধিকার নির্ধারণ করা হবে নারী-পুরুষ উভয়ের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিবেচনা মনে রেখে। ইসলাম পুরুষকে নারীর আর্থিক ব্যয়ভার বহন করার অনিবার্য দায়িত্ব দিয়েছে, নারীর মহর আদায় করা পুরুষের উপর ওয়াজিব করেছে। মিরাস বন্টনের ক্ষেত্রে ইসলাম যদি এই সব বিষয় বিবেচনায় এনে থাকে এবং পুরুষকে তুলনামূলক বেশী মিরাস দিয়ে থকে তাহলে সেটা কি ইনসাফপূর্ণ হবে না ? মূলত ইসলামী শরীয়তের খণ্ডিত পাঠের ফলে এই ধরনের বিভিন্ন বিভ্রান্ত ধারণা তৈরি হয়।

নারীর বিরুদ্ধে ইসলামের অন্যায় পক্ষপাতের দ্বিতীয় যে উদাহরণটি দেওয়া হয় তা, ইসলাম দুই নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অনুরূপ গণ্য করেছে। এই ভ্রান্তির ভিত্তি নারীর সৃষ্টিগত স্বভাব সম্পর্কে অজ্ঞতা। আল্লাহ– বিশেষ এক

হেকমতে– নারীকে বিশেষ এক স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এই স্বভাব নারীকে অনেক সময় হাক্বিকত-সত্য অবধারণে বিপথে নিয়ে যায়। ফলে সঠিক সত্য অবধারণ ও আদায়ের জন্য সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে তার সহযোগী হিসেবে অপর একজন নারী থাকা জরুরী। অন্যথায় আইন অন্যায়-ফায়সালায় আক্রান্ত হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন :

﴿ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ﴾ البقرة: ٢٨٢

অর্থাৎ 'যাতে তাদের একজন ভুলে গেলে অন্যজন স্মরণ করিয়ে দেয়'– সূরা বাক্বারা (২৪২)। তবে মনে রাখা উচিত নারীর একান্ত ও ঘনিষ্ট বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে –যেমন দুগ্ধ দান, কুমারিত্ব, গোপন রমণীয় রোগগুলো– ইসলামী শরীয়ত একজন নারীর সাক্ষ্যকে গ্রহণযোগ্য মনে করে।

ইসলাম নারীর বিরুদ্ধে অন্যায় আচরণ করেছে এই দাবির পক্ষে আরেকটি যুক্তি এই যে : ইসলামী বিধানে নারীর দিয়ত পুরুষের দিয়তের অর্ধেক। এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে যে জিনিসটি বুঝতে হবে তা হল, দিয়তের সম্পদ ব্যবহার করে তার দ্বারা উপকৃত হয় কি মৃত ব্যক্তি ? মৃত ব্যক্তি, সে পুরুষ হোক বা নারী, নয়, দিয়ত সম্পদ পায় কিন্তু তার ওয়ারিসরা। যে কোন বিধানের ক্ষতির বিনিময় বিধানের ক্ষেত্রে তা নির্ধারণ করা হয় ক্ষতির পরিমাণ অনুসারে। এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটি মাথায় রেখে এবার সিদ্ধান্ত নিন : যার উপর তাদের আর্থিক ব্যায়ভারের দায়িত্ব আরোপিত, যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষ হয়ে থাকে , বৈষয়িক বিচারে সে মারা গেলে ওয়ারিসরা বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হবে নাকি যার উপর তাদের এই সব বৈষয়িক দায় দায়িত্ব নেই সে মারা গেলে ? সুতরাং পুরুষ নিহত হলেই তার পরিবারের ওয়ারিসরা

বৈষয়িকভাবে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই ক্ষতির বৈষয়িক ক্ষতিপুরণ অর্থাৎ দিয়তের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। এবং নারীর তুলনায় পুরুষের দিয়ত অধিক নির্ধারণ করা হয়েছে। এই কারণেই আংশিক দিয়তের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মাঝে কোন ফারাক করা হয় নি। যেমন অঙ্গের দিয়তের ক্ষেত্রে। যদি কোন অঙ্গহানি ঘটে এবং যার অঙ্গহানি ঘটেছে সে জীবিত থাকে এই ধরনের ঘটনায় দিয়তের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তে নারী-পুরুষের মাঝে কোন ফারাক করা হয় নি।

এই আলোচনা থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি : যে সব ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত নারী-পুরুষের মাঝে ফারাক করেছে এবং নারী বিরোধী পুরুষতান্ত্রিক পক্ষপাতের আশ্রয় নিয়েছে বলে দাবি করা হয়, সেখানে মূলত ফারাক করাই ছিল ইনসাফের দাবি। সেটাই স্বাভাাবিক এবং মানুষের বিধান নির্মাণের ইসলামী স্পিরিট ও পদ্ধতি তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

৩. শরীর, ভাবনা এবং আবেগের ক্ষেত্রে নারীর যে বিশেষ কাঠামো, তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এইগুলো মূলত নারীকে একটি বিশেষ ও মৌলিক দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত করে। সেই দায়িত্বটি মাতৃত্ব। নারী যদি এই দায়িত্ব পালন না করে তাহলে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে গড়া একটি জৈব-প্রাকৃতিক শক্তিকে অপচিত ও নষ্ট করা হবে। সুতরাং মাতৃত্ব ও তার সাথে সম্পর্কিত দায়িত্বগুলো পালন করাই নারীর প্রধান কর্তব্য। তবে যদি কোন ব্যক্তিগত বা সামাজিক কারণে নারীকে অন্য কাজ করতে, উপার্জনমূলক কোন পেশায় জড়াতে হয়, তাহলে তাতে ইসলামের কোন আপত্তি নেই। আর নারী যদি, তার পর যা হবার হোক, এমন ভাবনা থেকে অবাধ ভোগের জন্য স্বনির্ভর ও উপার্জনশীল হতে চায় এবং নানা ধরনের গৃহবহিরস্থ কাজ করে তাহলে

ইসলাম তা অনুমোদন করবে না। নারী বিনা প্রয়োজনে কিংবা নির্বোধ কোন আবেগ তাড়িত হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে নানা পেশায় আত্মনিয়োগ করতে শুরু করলে মানব প্রজন্মের জন্য তার ফলাফল খুব সুখকর হবে না। তাকে তার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মাশুল দিতে হবে। এই ধরনের সংস্কৃতি ও সামাজিক ব্যবস্থা মানুষের ঐতিহাসিক অস্তিত্বকেই বিপর্যস্ত করে দিতে পারে। কারণ সমাজ ও মানবিক ইতিহাস ও গঠন তার ধারাবাহিকতায় নারী-পুরুষ সম্পূরক উপাদানের মত কাজ করে। যে যার দায়িত্ব যদি পালন না করে তাহলে বিপর্যয় অনিবার্য।

নারী একই সাথে শিশুর মা এবং কোন মনিবের মজুর হতে পারে না। এই অবস্থায় সে কোন দায়িত্বই সঠিক ও পূর্ণাঙ্গরূপে পালন করতে পারে না। শিশুসদনের কর্মীরা শিশু পালনের বিষয়টি শামাল দিতে পারে, এম্পেরিসিজম-বাস্তব তথ্যনির্ভর পর্যবেক্ষণ এই দাবিকে সমর্থন করে না। তাছাড়া সে ক্ষেত্রে, যে জন্য দাম্পত্য জীবন, যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন 'যাতে তোমরা তার নিকট প্রশান্তি পেতে পার' এই পদ্ধতি তাকে ব্যহত করে নিশ্চিত। নারীকে ঘর পরিবার ও মাতৃত্বের দায়িত্ব থেকে বাইরে বের করে আনলে যদি বৈষয়িক উৎপাদন বাড়েও তাতে মানুষের কি আসে যায় যদি তার কারণে মানবিক উৎপাদন-জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয় ।

মানুষের স্বভাব এবং সমাজের প্রয়োজন উভয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ইসলাম নারীকে তার মূল দায়িত্ব পালন করতে উৎসাহিত করেছে এবং একে এবাদতের মর্যাদা দিয়েছে, যার জন্য তার সৃষ্টি। তাকে এই কাজ করার প্রতিভা দান করেছে। নির্বিঘ্নে সে যেন এই দায়িত্ব আদায় করতে পারে সে জন্য শরীয়ত নানা ব্যবস্থা করেছে। যেমন পুরুষকে তার আর্থিক ব্যায়ভার গ্রহণের দায়িত্ব দিয়েছে, যাতে মনযোগ দিয়ে, নিশ্চিন্তে সে মানবিক

উৎপাদনে নিয়োজিত থাকতে পারে, স্বামী-সন্তানের প্রশান্তি পূর্ণ করতে পারে। এবং সমাজকে নারীর তত্বাবধান গ্রহণ এবং সম্মাননায় উৎসাহিত করে। যেমন স্বামীর প্রতি কোরআনের আদেশ :

﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ النساء: ١٩

অর্থাৎ 'তোমরা তাদের সাথে উত্তম আচরণ কর'– সূরা নিছা (১৯)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

خيركم خيركم لأهلكم

অর্থাৎ 'যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি'– তিরমিযী। রাসূল আরো এরশাদ করেন :

إستوصوا بالنساء خيرا

অর্থাৎ 'তোমরা নারীদের হিতাকাংখী হও'– মুসলিম। এবং ইসলাম সন্তানকে মায়ের সর্বোচ্চ সম্মানের প্রতি উৎসাহিত করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেউ একজন জিজ্ঞেস করল, কে আমার উত্তম ব্যবহার পাওয়ার সবচেয়ে বেশী হক্বদার ? উত্তরে তিনি বললেন, তোমার মা।

৪. মুসলামানকে, নারী ও পুরুষ উভয়কেই, যে কোন ধারণা ও শব্দকে বিচার করতে হবে তার ইসলামী অর্থের মধ্যে থেকে। ভ্রান্ত ও অন্য চিন্তা থেকে আমদানী করা কোন অর্থ বা ব্যাখ্যা দ্বারা নয়। সুতরাং 'কাজ' বা 'পেশা, তার সদর্থকতা ও অর্থহীনতা বিচার করতে হবে তার ইসলামী ব্যাখ্যা দ্বারাই। নারীর কোন পেশা নেই। মুসলিম সমাজে নারী কাজ করতে পারে না । এই প্রকৃতির নেতিবাচক যে কথাগুলো সাধারণত বলা হয়, তা কাজের অনৈসলামী ব্যাখ্যা দ্বারা আক্রান্ত। আমরা মনে করি

আদর্শ মুসলিম সমাজে নারী-পুরুষ উভয়েই কাজ করে। পুরুষ 'কাজ' করছে রিজিক বা অর্থ উপার্জন এবং সমাজ গড়ার জন্য তেমনি নারীও 'কাজ' করছে তার বাড়িতে, সমাজের মূলভিত্তি অর্থাৎ পরিবার নির্মাণে।

'কাজ' এর ব্যাখ্যা ও অর্থের ক্ষেত্রে অধিকাংশের চিন্তা বিভ্রান্তিতে আক্রান্ত। নারীবাদীরা যখন নারীর কাজের কথা বলেন, নারীকে কাজ দেওয়ার দাবি জানান তখন 'কাজ' বলতে তারা মজুর-কর্মকে বুঝান অর্থাৎ এমন কাজ যার বিনিময় বা মজুরী থাকে, নারী কাজ করবে এমন কোন ব্যক্তির অধীনে যার সাথে তার সম্পর্ক হবে বিশুদ্ধ বৈষয়িক। সুতরাং এই চিন্তা, নারী তার বাড়িতে যে সব কাজ করে– উদাহরণত সন্তান প্রতিপালন, বাবা মায়ের সেবা, ঘরাকন্না করা, রান্না-বান্না করা– সেগুলোকে 'কাজ' মনে করে না। কারণ এই কাজে নারী কোন মজুরী পায় না। এই চিন্তা অ-মজুর নারীকে মনে করে অক্রিয়। তাদের ধারণা নারীকে যদি ঘর থেকে বের করে 'কাজের বাজারে' না আনা যায় তাহলে সমাজের অর্ধেক অক্রিয় হয়ে যাবে। এগুলো ভুল চিন্তা। তবে এই ধরনের ভাবনা শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সবাইকে আক্রান্ত করেছে। এমনকি, নারী ঘরে থেকে সন্তান প্রতিপালন ও ঘরকন্নার দায়িত্ব পালন করবে নাকি ঘরের বাইরের কোন পেশায় নিয়োজিত হবে, এই সিদ্ধান্ত নারীর সামনে হাজির হয়েছে এই ভাষায় : তুমি স্বাধীন শ্রমিক হবে না অক্রিয় ঘরকুনো ? অথচ সঠিক ভাষায় বললে এই সিদ্ধান্তের ভাষা এমন হওয়া উচিৎ : তুমি অন্যের অধিনস্থ মজুর হবে না স্বাধীনভাবে তোমার নির্ধারিত প্রাকৃতিক দায়িত্ব পালন করবে ?

কাজ সম্পর্কে এই ভুল ধারণা পরিবার সমাজ এবং ব্যক্তি নারীকে, ঘরের স্বাধীন শ্রমিক না হয়ে, বাইরের অধীন মজুর

হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। এর ফলে নারী অনেক গুলো অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। সে নিজের উপর জুলুম করে, স্বামী ও সন্তানদের পারিবারিক দায়িত্ব পালনের তার যে প্রাকৃতিক ভূমিকা তাতে অবহেলা করে, পুরুষের কর্ম সুযোগ সংকুচিত করে দেয়। এর ফলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায় এবং তাতে নিরাপত্বা, অর্থনীতি ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এর কারণে বিয়ে সংকট দেখা দেয় এবং বিবাহহীন আইবুড়ো নারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। এইভাবে একটি প্রতারণামূলক লক্ষ্য বাস্তবায়িত করতে গিয়ে একটি সংকটময় পরিস্থিতির জন্ম দিতে বাধ্য হয় নারী। আশীর দশকে জাতিসংঘের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে ... 'নারী বাইরের পেশায় জড়িত হওয়ার ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে/রাজস্বে ৪০% ভাগ চাপ বৃদ্ধি পায়'। সুতরাং, নারী উপার্জনশীল কাজে অংশগ্রহণ করলে অর্থনৈতিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, এই দাবী. জাতীসংঘের এই রিপোর্ট অনুসারেই, সঠিক নয়। এই রিপোর্টেই অন্য আরেক জায়গায় বলা হয়েছে : ঘরের কাজের জন্য যদি নারীকে মজুরী দেওয়া হয় তাহলে তা হবে প্রতিটি জাতির রাজস্ব ব্যায়ের অর্ধেক পরিমাণ'।

ব্যক্তিগত বা সামাজিক কোন প্রয়োজনে কোন নারী যদি, শরীয়তের সীমায় থেকে, তার স্বভাব-প্রকৃতির উপযোগী কোন পেশা গ্রহণ করে তাহলে শরীয়ত তাকে না-জায়েয বলবে না। কারণ সামাজিক ও ব্যক্তিক প্রয়োজনে কোন নারীর পেশা গ্রহণের তাগিদ পুরুষের কর্মক্ষেত্রে নারীর জোর প্রবেশের প্রমান হিসেবে অথবা নারী তার মূল কর্মক্ষেত্র থেকে সরে আসার দলিল হিসেবে দাঁড় করানো যায় না।

এই প্রয়োজন দূর করতে এবং তার পরিধি সংকীর্ণ করতে সমাজ ও রাষ্ট্রকে উদযোগী হতে হবে। এটা বড়ই অন্যায় হবে

যে চাকুরির ক্ষেত্রে কর্ম প্রকার, কর্ম এলাকা, কর্ম সময়, ছুটি-অবকাশ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর সাথে আচরণ হবে পুরুষের সমমান। বরং যেখানে নারীকে কাজ করতে হয় সেখানে নারীর বিশেষ স্বভাব ও শারীরিক কাঠামোর সাথে সংগতি রেখে এবং তার যে পারিবারিক মৌলিক দায়িত্ব রয়েছে তার কথা মনে রেখে নারী কর্মীদের জন্য কর্ম নির্বাচন বিষয়ে রাষ্ট্রকে দৃঢ়ভাবে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই সমস্যা সমূলে উৎপাটনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রকে দারিদ্র্য মুক্ত করা। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দারিদ্র্য নারীকে তার স্বভাবের অনুপযোগী কাজ গ্রহণ করতে বাধ্য করে।

৫. মুসলিম সমাজগুলোর প্রচলিত শিক্ষা এবং তার পদ্ধতি কৌশল নিয়ে নতুনভাবে ভাবা উচিৎ। নারী এবং তার কর্ম সংক্রান্ত সংকটের সাথেও শিক্ষা বিষয়টি গভীরভাবে জড়িত। এমন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে যা সমাজকে নারীর প্রাপ্য মর্যাদা দিতে প্রস্তুত করে। যে কাজ তার প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক দায়িত্ব , যা একান্ত তার সাথে সম্পৃক্ত সে ছাড়া আর কেউ তা পালন করতে পারে না, যে শিক্ষা নারীকে সে দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত এবং প্রস্তুত করে তোলে। মুসলিম সমাজে নতুন সংস্কৃত এবং এমন শিক্ষা পদ্ধতি প্রণয়ন করতে হবে যা নিম্নোক্ত মৌলিক লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়ন করতে পারে :

ক. এমন নারী বের করা যে তার রবের ইবাদত করবে সুন্দরভাবে।

খ. স্বামীর সাথে আচরণে হবে নান্দনিক।

গ. সন্তানদের প্রতিপালনে হবে আদর্শ মা।

ঘ. সংসার পরিচালনায় হবে আদর্শ ঘরণী।

৫. সমাজ বিনির্মাণে হবে আদর্শ রমণী।

নারী ও পুরুষের অনুরূপ শিক্ষাপদ্ধতি মূলত নারী বিরোধী এবং নারীর জন্য অবমাননাকর শিক্ষাব্যবস্থা। কারণ এই শিক্ষা ব্যবস্থা নারীর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি মনযোগ না দিয়ে নারী ও পুরুষকে একই সিলেবাস ও পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয় এবং নারী ও পুরুষকে একই দায়িত্ব ও পেশার জন্য প্রস্তুত করে। মেয়েদের বিবাহহীনতা, তালাক্ব, মানসিক হতাশা, ইত্যাদি সামাজিক সংকটের পিছনে, সাম্প্রতিক গবেষণাগুলো প্রমাণ করছে, এই তথাকথিত সম শিক্ষার ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।

সুতরাং সমাজের, বিশেষত সমাজের চিন্তাশীল সদস্যদের দায়িত্ব, যা শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষার বিষয় এবং শিক্ষার লক্ষ্য, সব ক্ষেত্রে নারী পুরুষের অভিন্ন ব্যবস্থার কথা বলে, এমন যে কোন দাবি, সিদ্ধান্ত ও তৎপরতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং শরীয়তসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের চেষ্টা করা, যা কল্যাণের বিস্তার ঘটাবে, ফাসাদ দূর করবে, সামাজিক জীবনকে সুস্থ-স্থীর করবে, সমাজের প্রতিটি সদস্যকে তার উপযোগী অধিকার দান করবে এবং সমাজকে সম শিক্ষার অভিশাপ-অনিষ্ট – তা যে অনিষ্টকর, বাস্তব অভিজ্ঞতা তা প্রমাণ করেছে– থেকে মুক্তি দেবে।

৬. আল্লাহ তায়ালা জুলুম হারাম করেছেন। বান্দাদের মাঝে কোন ধরনের অবিচার করা যাবে না। এক হাদীসে কুদসীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন :

يا عبادي إني حرمت الظلم علي نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا

অর্থাৎ 'হে আমার বান্দারা আমি নিজের উপর জুলুম হারাম করেছি এবং তোমাদের মাঝেও তা হারাম করেছি। সুতরাং

তোমরা পরস্পর অবিচার করো না'– মুসলিম। সুতরাং মুসলানদের অন্যতম দায়িত্ব ,সামাজিক ইনসাফ নিশ্চিত করা এবং সমাজকে জুলুমমুক্ত রাখা। সবচেয়ে নিকৃষ্ট সামাজিক জুলুম নারীর বিরুদ্ধে জুলুম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করেছেন : 'হে আল্লাহ ! আমি এতীম ও নারী এই দুই দুর্বলের হক্বের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছি'– নাছাঈ। নারীর বিরুদ্ধে জুলুম হতে পারে নানাভাবে। উদাহরণত নারীকে, সে মা বা স্ত্রী বা মেয়ে হোক, তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা, তার দুর্বলতা ও নারীত্বের সুযোগ নেওয়া। আল্লাহ তায়ালার দেওয়া জীবন পদ্ধতি থেকে দূরে সরে যাওয়া, শরীয়ত বিরোধী নানা চিন্তা ও অনুশীলনের অনুসরণ এবং নারী-জুলুম বিরোধী কোন ধর্মীয় ও নৈতিক তৎপরতা না থাকার ফলে আজ সমাজে এই সব নারী-জুলুম ব্যাপক বিস্তার পেয়েছে। মুসলিম সমাজগুলো পাশ্চাত্য মূল্যবোধ ও জীবন পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে পাশ্চাত্য সমাজের সংকট ও অসুস্থতাগুলোয় আক্রান্ত হচ্ছে মুসলিম সমাজগুলোও। উদাহরণত পারিবারিক বিবাদ, লৈঙ্গিক দ্বন্দ্ব, দাম্পত্য বিশ্বাসঘাতকতা মুসলিম সমাজে ইত্যাদি নেতিবাচক সামাজিক প্রবঞ্চগুলো ছড়িয়ে পড়ছে। অনুরূপ ইনসাফহীন দাম্পত্য জীবন, নারীর উপর বলপ্রয়োগ, অন্যায়ভাবে তাদের সম্পদ আত্মসাৎ, তাদের অর্থনৈতিক তত্ত্বাবধানে অবহেলা, তালাকের ক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা ও অধিকার ক্ষুণ্ন করা এই সব সামাজিক ও নারী-বিরোধী অপরাধে আক্রান্ত হচ্ছে মুসলিম সমাজ। বাবা অনেক ক্ষেত্রে, তাদের প্রতিপালনে অবহেলা করে, আর্থিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে পুত্রদের প্রতি অন্যায় পক্ষপাৎ করে কিংবা অপাত্রে বিয়ে বা বিয়ে বিলম্ব করে, জুলুম করছে মেয়ের উপর। এর কোনটিকেই শরীয়ত সমর্থন করে না।

বরং এগুলো পবিত্র ইসলামী শরীয়ত থেকে দূরে সরারই অনিবার্য প্রাকৃতিক পরিণতি।

এই জুলুম দূর করা কিংবা সম্ভাব্য পরিমাণে তাকে লাঘব করা একটি শরয়ী দায়িত্ব। শুধু অনিবার্য শরয়ী দায়িত্ব হিসেবেই মুসলিম সমাজকে কাজ করে যেতে হবে : যে সব কারণ ও প্রথার ফলে এই জুলুম অন্যায় হচ্ছে তা সরাতে হবে অথবা সংস্কার করতে হবে। এই ক্ষেত্রে সাংগঠনিক ও আইনী ব্যবস্থা ও তৎপরতাগুলো সহজ করতে হবে, যাতে এই জুলুমগুলোকে সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই রোধ করা যায় বা কোথাও সংঘটিত হয়ে গেলে তা বন্ধ করা যায়। মৌলিকভাবে এই ধরনের অন্যায়-অবিচার রোধকল্পে, সামাজিক পর্যায়ে ধর্মীয় ও নৈতিক সচেতনা তৈরির উদ্দেশ্যে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। ব্যক্তি ও সমাজের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনে অর্থবহ সংস্কার আনতে হবে, শরীয়ত আশ্রিত অধিকার ও বিধানাবলী এবং তা পালনের বৈধ উপায়গুলো সম্পর্কে গণসচেতনতা তৈরি করতে হবে। মুসলিম সমাজকে সতর্ক করতে হবে তারা যেন পশ্চিমা ভাবধারা, আচার-অনুশীলণ এবং তার অধিকার-চিন্তা ও তা বাস্তবায়ন পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই ক্ষেত্রে শরীয়তী বিধানের ব্যাপারে উদাসীন না হয়ে পড়ে।

৭. পশ্চিমের যে নির্দিষ্ট নারী ভাবনা ও অনুশীলন তার নিজস্ব ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে পশ্চিম তার নিজস্ব নানা সংকট থেকে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। সুতরাং পশ্চিমের নিজস্ব ভূ-ভাগ, পরিবেশ ও সমাজে, যদিওবা এই সিদ্ধান্তগুলোর একটি ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, কিন্তু পশ্চিম ছাড়া অন্য কোন ভূ-অঞ্চল ও সমাজ বিশেষত ইসলামী সমাজে এই চিন্তার অনুশীলনের কোন যুক্তি নেই। বরং অন্য

পরিবেশ ও সমাজে তার প্রভাব অবশ্যই নেতিবাচক হতে বাধ্য। পশ্চিমের নির্দিষ্ট এই নারী ভাবনা ও অনুশীলনের মূল কারণ তিনটি : প্রথমত, পশ্চিমের আইন ও বিধান নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডের পক্ষপাতপুষ্ট, ও তার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও অধিকারগত ঐতিহাসিক বিবাদনির্ভর। আর এটাকেই বিশ্বায়নের চেষ্টা করা হচ্ছে। যদিও এ ভূ-খন্ডের সাংস্কৃতিক ও আইনি তফাত বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে বিস্তর। দ্বিতীয়ত : পশ্চিমের লোকদের পুজিবাদী-মুনাফাকামী মানসিকতা এর আরেকটি কারণ। পশ্চিমের দেশগুলোতে বস্তুকেন্দ্রিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। বস্তুস্বার্থ নিয়ন্ত্রণকারী কোন চারিত্রিক ও মূল্যবোধিক ধারাকে আদৌ মূল্যায়ন করা হয়না। তৃতীয়ত : যাবতীয় নীতি নৈতিকতা, মূল্যবোধ এড়িয়ে মুনাফাকামী মানসিকতাই ক্রিয়াশীল থাকে পশ্চিমাদের মাঝে। কাছাকাছি বসবাস, অথবা পরিসংখ্যান-গবেষণা, ও বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্টসমূহের পাঠ থেকে এ বিষয়টি উজ্জ্বল হয়ে ধরা পড়ে। এই যাতনাদায়ক সামাজিক অবস্থাই– যা বিশ্বায়নের চেষ্টা করা হচ্ছে– পাশ্চত্য সমাজের প্রকৃত চেহারা। যদিও তা সংবাদ মাধ্যমের প্রবঞ্চক পর্দায়, অধিকার বিষয়ক মিথ্যা মোড়কে, ঢেকে রাখার চেষ্টা করা হয়। কেননা সেখানে পারিবারিক হিংস্রতা, শ্লীলতাহানী, যৌন বিড়ম্বনা–এমনকি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিকদের ক্ষেত্রেও – ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অনুরূপ জীবীকা অর্জনের উদ্দেশ্যেও বেড়ে চলেছে নারীর যাতনা। এক অভিবাবক সম্পন্ন অথবা আদৌ অভিভাবক নেই এ ধরনের বাচ্চাদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে ক্রমেই। এই সব নানা কারণে পশ্চিম, সামাজিক ও আইনগত প্রসেসের মধ্য দিয়ে, বিবাহ বহির্ভূত নারী-পুরুষের এক সাথে জীবনযাপন, পরিবারের বিকল্প হিসেবে হাজির করেছে। বিস্তার ঘটেছে জেণ্ডার ধারণার।

ফ্রান্সের পারলামেন্টে উপস্থাপিত একটি বাৎসরিক সরকারী রিপের্টে পশ্চিমা সমাজের পরিবার, বিয়ে ইত্যাদি বিষয়ে নারী সংকটের একটি ভয়াবহ চিত্র খোঁজে পাই। তাতে বলা হয়েছে : ফিনল্যাণ্ড, নরওয়ে ও সোভিয়েতের পর, ফ্রান্স দ্রুত সেই পরিণতির দিকে যাচ্ছে, যেখানে বিয়ের হার দ্রুত কমছে, বিয়েপ্রথা হারিয়ে যাচ্ছে, বিস্তৃত হচ্ছে নারী-পুরুষের বিয়েহীন স্বাধীন দাম্পত্যজীবন। বৎসরে ৪৫০.০০০ নারী-পুরুষ যুগল এই ধরনের স্বাধীন সম্পর্ক গড়ছে। তেমনি বাড়ছে সমকামীদের– গ্যে ও লেসবিয়ান– কোন যুক্তিহীন স্বাধীন দাম্পত্যজীবন। বর্তমানে এই ধরনের সম্পর্কের বাৎসরিক হার ৩০.০০০।

৮. মুসলিম সমাজে আইন প্রণয়ন পদ্ধতির দৈত্ব , এবং সামাজিক ও নৈতিকতা নির্দেশক উৎসের দৈত্ব, মূলত মুসলমানদেরকে দ্বীন সম্পর্কে বিভ্রান্ত করছে, দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে, এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে এমন এক অন্ধকার জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে যেখানে সব ধরনের আলো থেকে বঞ্চিত হতে হয় মানুষকে। ফলে তারা সঠিক পথ খুঁজে পায় না। সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, নৈতিকতা, ইত্যাদি নানা প্রকৃতির ইটের সমন্বিত গাথুনিতেই গড়ে উঠে একটি সমাজ। ফলে এর কোন একটিতে যদি সংকট দেখা দেয় তাহলে তা অন্যান্য অঙ্গকেও আক্রান্ত করে। তাই সমাজ সংস্কারের ব্যাপারটি আমাদের ভাবতে হবে ব্যাপকভাবে। সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, নৈতিকতা, সব ক্ষেত্রেই ইসলামী শরীয়তকে মূল মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, পশ্চিমা ধর্ম-নিরপেক্ষতাকে তাড়াতে হবে আইনসহ সমাজের সকল জায়গা থেকে। সব কিছুর ভিত্তি হবে আল্লাহ প্রদত্ব প্রত্যাদেশ। যার আগে-পিছে কোন অসত্য আসতে পারে না। পবিত্র কোরআনে এসেছে :

﴿ لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾

فصلت: ٤٢

অর্থাৎ ‘সামনে, পিছনে কোন দিক থেকে তার নিকট বাতিল আসতে পারে না। তা অবতীর্ণ প্রশংসিত প্রজ্ঞাবানের কাছ থেকে’ –সূরা ফুসসিলাত (৪২)। সাথে সাথে মানবতাকে দিতে হবে মানবাধিকারের সত্যিকার বাস্তবায়িত রূপ। নারীকে দিতে হবে শরীয়ত নির্ধারিত ইনসাফের আওতায় স্বাধীনতা ভোগের পূর্ণ ইখতিয়ার। ধর্ম ও মূল্যবোধে আরোপিত নারীকে রক্ষা করতে হবে সকল প্রকার জুলুম অন্যায় থেকে। চাই তা পাঠশালায় হোক অথবা পরিবার গঠনের ইচ্ছাপোষণ কালে , অথবা প্রয়োজনের সময় রিজিক অন্বেষণের ক্ষেত্রে।

চতুর্থত : নির্দেশনা

১. মুসলিম উম্মাহ ও মুসলিম সমাজ

ক. মুসলিম সমাজ যেন কোন ভাবেই, সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে, আল্লাহর শরীয়ত থেকে বিচ্যুত না হয়ে পড়ে। ইসলামী নৈতিকতা সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা যেন আমাদের মাঝে তৈরি না হয়। এই সম্পর্কে সর্বাত্মক সতর্ক থাকতে হবে। অন্যথায় মুসলমানদেরকে বৈষয়িক এবং পারলৌাকিক মাশুল দিতে হবে। কারণ এটা এক ধরনের মানসিক ও সাংস্কৃতিক পরাজয়, যা আমাদেরকে আমাদের শত্রুদের সামনে অপদস্থ-অবনত করে রাখে এবং তাদেরকে আমাদের উপর শক্তিশালী করে তোলে। এবং আল্লাহ তায়ালা এর জন্য ইহলৌকিক ও পারোকালিক শাস্তির কথা বলেছেন। তিনি এরশাদ করেছেন :

﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ النور: ٦٣

অর্থাৎ 'যারা তার নির্দেশের অন্যথা করে তারা যেন সতর্ক থাকে, তাদেরকে ফিৎনা-বিপর্যয় বা যন্ত্রণাকর শাস্তি আক্রান্ত করবে,– সূরা নূর (৬৩)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন :

إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله

অর্থাৎ 'আল্লাহ তায়ালার গায়রাত আছে। তিনি যা হারাম করেছেন মোমেন যখন তা করে তখন তার গায়রাত এর প্রকাশ ঘটে'– বোখারী।

খ. নৈতিকতা ও চরিত্র সংরক্ষণ। নৈতিকতা ও চরিত্র সংরক্ষণের জন্য মুসলিম সমাজের শিক্ষা ও পেশা তৎপরতা এবং প্রচার মাধ্যম, বিনোদন ও সংস্কৃতি ইত্যাদির অভিমুখকে সঠিক পথে রাখতে হবে। উদাহরণত শিক্ষা ও পেশা এই দুই এলাকায় নারী-পুরুষের সহাবস্থান রোধ করাই হচ্ছে সমাজের নৈতিকতা ও চরিত্র সংরক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। এই থেকে আমরা বুঝতে পারব কি কারণে সম্ভ্রমবিরোধীরা জাতিসংঘের 'নারী-পুরুষে সকল প্রকার পার্থক্য মূলউৎপাটন' বিষয়ক অঙ্গীকারের পক্ষে আদাজল খেয়ে লেগে যায়। সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সহাবস্থানের কথা বলে।

মূলত প্রচার সংস্থা ও মঞ্চ এবং পর্যটন সংস্থার বিজ্ঞাপনসমূহের লক্ষ্য নিছক বাণিজ্য ও মুনাফা। এই ক্ষেত্রে তারা ধর্ম ও নৈতিকতার কোন পরওয়া করে না। এই বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা পদ্ধতি সমাজের চরিত্র নৈতিকতার জন্য খুবই বিপদজনক। মুসলিম সমাজকে এই সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। সমাজের চিন্তাশীল, সচেতন সদস্য, সাধারণ ধার্মিক সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগুলো প্রতিরোধ করতে হবে।

গ. শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মিডিয়ার এলাকায়, ইসলামের শত্রুদের খুশী করার জন্য কিংবা তাদের মনোহর রূপে মুগ্ধ-আক্রান্ত হয়ে যে সব নির্বোধরা নারীর শরীয়তপ্রদত্ব অধিকার বিরোধী কাজ করছে বা এমন তৎপরতা চালাচ্ছে যা পরিণতিতে নারীর ধর্মীয় অধিকার ক্ষুণ্ন করে, সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় কতৃপক্ষের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের প্রতিরোধ করা। এই ধরনের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা থেকে বিরত রাখা। সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন :

ولتأخذن علي يد الظالم ولتأطرنه علي الحق أطرا

অর্থাৎ 'জালেমের হাত ধরে তাকে হক্বের উপরে ঝুকিয়ে দিবে'– আবু দাউদ।

ঘ. সমাজের জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কর্তব্য হচ্ছে, নারী-পুরুষের ব্যক্তিগত জীবন এবং পরিবার সমাজের নৈতিকতা ও ধার্মিকতা সংরক্ষণে তাদের যে দায়িত্ব সে ক্ষেত্রে কোন ধরনের অবহেলা না করা। যত ক্ষুদ্রই মনে হোক যে ক্ষেত্রেই তাদের এই দায়িত্ব পালনের প্রশ্ন আসবে তাদের কর্তব্য হবে, দ্বীন ও তার প্রতীকগুলো এবং তার মর্যাদা ও গুরুত্ব রক্ষায়, ছাওয়াবের নিয়তে, সে দায়িত্ব পালন করা। নিশ্চই রাজনীতি ও কুটনীতি থেকে দ্বীন অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন :

﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ آل عمران: ١٠٤

অর্থাৎ 'তোমাদের মাঝে যেন এমন একটি দল থাকে, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে বারন করবে। আর তারাই সফল'– সূরা আলে ইমরান (১০৪)।

ঙ. এলম গোপন করা বা প্রয়োজনের সময় না বলার যে বিপদ সে বিষয়ে জোর তাগিদ করা। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَـٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْاْ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴾ آل عمران: ١٨٧

অর্থাৎ ‘স্মরণ করুন সেই সময়কে, যখন আল্লাহ কিতাবিদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, তোমার তা মানুষের নিকট বয়ান করবে এবং গোপন করবে না। তারা তা তাদের পিছনে ফেলে রাখল এবং স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করল। তাদের এই বেচাবিক্রি কতইনা নিকৃষ্ট’– সূরা আলে ইমরান (১৮৭)। বিশেষত যখন ধর্মের মূল-মৌলিক বিষয়গুলো এবং সমাজের নৈতিকতা ও মানুষের অধিকার আক্রান্ত হয় তখন সে সম্পর্কে বক্তব্য না দেওয়া এবং এলম গোপন করা মারত্মক অপরাধ। তার চেয়েও ভয়াবহ কোন কিছুর লোভে বা ভয়ে বা কাল্পনিক ভ্রান্ত কোন কল্যাণের আশায় শরীয়তের পরিবর্তীত-বিকৃত বিষয়গুলোর ন্যায্যতা দানের জন্য শরীয়তের মূল ভাষ্য মূলনীতিগুলোর ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া।

চ. এই ব্যাপারটি অনুধাবন করা যে, সমাজ-সংস্কৃতি, নৈতিকতা ও অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে পশ্চিমা মূল্যবোধগুলো যে বিশ্বব্যাপী আধিপত্য করছে তার কারণ শক্তি ও ক্ষমতা। তার কারণ এই নয় যে, পশ্চিমা মূল্যবোধগুলো নির্ভুল সঠিক, মানুষের মূল স্বভাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এই মূল্যবোধগুলো পশ্চিমেরই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, তার উৎপাদন। তার মাঝে জনকের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা মানুষের ফিতরাত মূল-স্বভাবের সাথে সংঘাতপূর্ণ। তাহলে পশ্চিমের মূল্যবোধ ও মূল্যনীতিগুলো বৈশ্বিকভাবে– সব অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে– গ্রহণযোগ্য সফলভাবে বাস্তবায়নযোগ্য হতে পারে না। তার উপর ভিত্তি করে যে কোন সমাজ ও সংস্কৃতির মানুষের অধিকার নির্ধারণ করা উচিৎ হবে না – এই ব্যাপারে নতুন করে ভাবা উচিৎ এবং আমরা জোরের সাথে বলছি, এই সব ক্ষেত্রে মানুষের মূল স্বভাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মূলনীতি কি হতে পারে, গুরুত্বের সাথে তা পুনরায় ভাবা উচিৎ। তাহলে দেখা যাবে

ইসলামী মূলনীতিগুলো মানুষের মৌল স্বভাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং একমাত্র এই মূলনীতিগুলোই হতে পারে বৈশ্বিক মূল্যনীতি-বোধ, বিশ্বের ও ইতিহাসের সকল মানুষের অধিকার নির্ধারণের সঠিক পরিমাপক।

২. মুসলিম নারী

ক. মুসলমান হিসেবে প্রতিটি নারীর কর্তব্য, প্রতিবেশ-বাস্তবাতার প্রতিকুলতায় শরীয়তের শিক্ষা ও বিধান পালনে অবহেলা না করা। এই ক্ষেত্রে বিশেষ যে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে তা শরয়ী পর্দা। সম্প্রতি সময়ে এই বিধান পালনের ক্ষেত্রে অনেক প্রতিকুলতার মুখোমুখী হতে হচ্ছে। মোমেন নারীর কর্তব্য হবে সব প্রতিকুলতা এড়িয়ে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা এবং নিজের মর্যাদা-সম্ভ্রব রক্ষার জন্য এই বিধান পালন করে যাওয়া। মুসলিম সমাজ রক্ষা, আমাদরে শত্রুদের –যারা পার্থিব ও আপার্থিব উভয় ক্ষেত্রে আমাদের জন্য ক্ষতি ও অমঙ্গলের কারণ– প্রতিরোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম মুসলিম-মোমেন নারীদের পর্দার বিধান সঠিকভাবে পালন। ইসলামের এই প্রতীক ও বিধানটি যখন শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত, তাদের হামলার অন্যতম লক্ষ্য, তখন এই বিধানটি সঠিকভাবে পালন করা, ও টিকিয়ে রাখাই হবে মুসলিম নারীর জিহাদ।

গ. আল্লাহর এবাদত পালন ও যে সব সামাজিক দায়িত্বে নারীকে নিয়োজিত হতে হয়, সেগুলোতে নারীকে সক্রিয়ভাবে অংশ করতে হবে। নারীর সামাজিক কর্তব্য ও এবাদতের অন্যতম হল : সন্তানদের সঠিক-সুন্দরভাবে প্রতিপালন করা, পরিবার রক্ষায় মনযোগী হওয়া, বিশেষ কোন প্রয়োজন ছাড়া বাড়িতেই

অবস্থান করা, ব্যক্তিজীবনে অনুশীলনের মাধ্যমে শালীনতা-সম্ভ্রম ইত্যদি প্রচার করা ও অন্যান্য নারীদের কল্যাণের পথে আহ্বান করা ও অকল্যাণ হতে বারণ করা। নিজের মালিকানাধীন সম্পত্তিতে আল্লাহর হক্ব সম্পর্কে সচেতন থাকা। অর্থাৎ আল্লাহ যেখানে খরচ করতে বলেছেন সেখানে খরচ করা, অসার-অর্থহীন সামাজিক প্রতিযোগীতায় অপচয় না করা।

উপসংহার

সর্বশেষে যেটা উল্লেখ করা জরুরী তা হল, প্রায়োগিক ও বাস্তব কর্মকাণ্ডের উপর– জ্ঞানগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা ও সিদ্ধান্তের পর– জোর দেওয়া। এই ক্ষেত্রে এমন বাস্তব কোন কর্মসূচী গ্রহণ করা, যা সমাজে সত্যিকার জাগরণ তৈরি করবে, ইসলাম নারীকে যে অধিকার দিয়েছে তার প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে এবং পশ্চিমের নারী ও সমাজ যে অসুখকর পরিণতিতে আক্রান্ত হয়েছে তা এড়িয়ে সমাজে নারীর বাস্তব উৎপাদনশীল অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করবে। এভাবে মুসলিম নারী ও সমাজ অন্যান্য সমাজের জন্য আদর্শ হওয়ার সম্মান লাভ করবে।

এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, যা নারীর স্বপক্ষের সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়িত করবে। তাই মুসলিম সমাজের চিন্তাশীল ও বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব অর্থনীতি, নৈতিকতা ইত্যাদি ক্ষেত্রের সমাজ গবেষক-বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করা এবং শিক্ষা, পেশা, বিনোদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুস্থ সমাজ ও নারীর জন্য উপযোগী সর্বোত্তম পদ্ধতি ও কর্ম পন্থা

উদ্ভাবন করা এবং তা বাস্তবায়নের বাস্তব নকশা তৈরি করা। তবে এই সব সিদ্ধান্ত ও তৎপরতাগুলোর প্রধান ভিত্তি হবে দুইটি :

এক. বিশ্বাস, বিধান এবং লক্ষ্যের ক্ষেত্রে শরীয়তের মূলনীতির অনুসরণ

দুই. জীবনের নব বিকশিত বাস্তবতার সাথে সঙ্গতি রাখা

সমাজকে সুষ্ঠ রাখা এবং সমাজকে একটি সুস্থ সুন্দর জীবন উপহার দেওয়ার প্রচেষ্টা-তৎপরতা সফল হওয়ার প্রধান শর্ত তার দায়িত্ব আলেম, চিন্তাশীল ও বিষেশজ্ঞদের হাতে থাকা। দ্বীন সম্পর্কে যাদের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান নেই, শরীয়তের বিধান ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য যারা জানে না এবং যে সব মুসলিম সন্তানরা সাংস্কৃতিক ও মানসিকভাবে পশ্চিমের কাছে পরাজিত, তারা যেন এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাদের হাতে না ছেড়ে দেন। কিংবা পরিবর্তনশীল বাস্তবতাকে যেন কখনো এর নির্ধারক ও পরিচালক না বানানো হয়। কারণ নিছক বাস্তবতার সিদ্ধান্ত অনেক সময় মানুষের কল্যাণের সবচেয়ে বিশ্বস্ত উৎস শরীয়ত বিরোধী হতে পারে। যে চিন্তা শরীয়তের সঠিক জ্ঞানে অনুপ্রাণিত, এবং যা বাস্তবতা ও তার সম্ভাবনা-চ্যালেঞ্জগুলো বুঝে – এই প্রচেষ্টাকে সফল করার জন্য এই উভয় প্রকার চিন্তার সমন্বয় জরুরী। এই সমন্বিত চিন্তা এমন কোন সিদ্ধান্ত দিবে না বাস্তাবতার প্রেক্ষিতে যা আদায় করা অসম্ভব। কিংবা সব সিদ্ধান্তের ভার বাস্তবতার হাতে ছেড়ে দিবে না, বরং বাস্তবতা ও শরীয়তের সমন্বয়ে সমাজের জন্য একটি কার্যকরী কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবন করবে। সুতরাং এই সব সংকট থেকে মুক্তির জন্য, দ্বীনী আলেম-জ্ঞানী ও নৈতিকতা, সমাজ-পরিবর্তন, সমাজ-সংগঠন ইত্যাদি এলাকার আন্তরিক গবেষকদের আশু মিলন এবং সমন্বিত একটি চিন্তা ও

কর্ম পদ্ধতির উদ্ভাবন জরুরী। এই ক্ষেত্রে যে কোন অবহেলা মুসলিম সমাজের অমঙ্গল ডেকে আনবে।

ভাল কি খারাপ, ধর্মের সাথে কোথায় কোথায় সংঘর্ষশীল, মানুষের আচরণগত অবস্থা ও জীবনযাপনের ধারা – ভাল কি মন্দ অথবা ধর্মের সাথে সংঘর্ষশীল কি না– সে বিবেচনা বাদ দিলেও, সময়ের আবর্তে একদিন তা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছতে পারে যেখানে 'মূল্যবোধ'-এর রূপ পরিগ্রহ করতে পারে অথবা মৌলিক চাহিদার আকার ধারণ করতে পারে। সে সময়, অন্যসব বিবেচনা বাদ দিয়েই মানুষ তা তলব করতে শুরু করবে। তখন তার পরিবর্তন সংস্কার তো পরের কথা, তাকে সঠিক নির্দেশনা দেওয়াও সম্ভব হবে না।

অনেক হতাশার মাঝে আশার খবরটি হচ্ছে, বর্তমানে ইসলাম পৃথিবীর সবচেয়ে বর্ধশীল ধর্ম। বিস্ময়কর ব্যাপার হল নব ইসলাম গ্রহণকারীদের, বিশেষ করে পশ্চিমের নও মুসলিমদের, অধিকাংশই নারী। ইসলাম, বিশেষত নারীর ক্ষেত্রে ইসলামের ভূমিকা ও বিধানের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিকৃত প্রচারণা সত্ত্বেও, এবং ইসলাম গ্রহণ করার ফলে পাশ্চত্যের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সাংগঠনিক জীবনে নানা সংকট প্রতিকুলতায় আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও নারীরা ব্যাপকভাবে ইসলাম গ্রহণ করছে। কারণ ইসলামী শরীয়ত মূলত নারীদেরকে সঠিক সম্মান ও প্রকৃত স্বাধীনতা দান করতে সক্ষম। তারা এর প্রমাণ পেয়েছেন।

وصلى الله علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين